# অপ্রকাশিত রচনা

রচনাবলীর এই অংশে সৈয়দ মুজতবা আলীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা সংকলিত হল। এর মধ্যে আছে ছোটদের লেখা, কবিতা, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ ও কিছু রাজনৈতিক প্রবন্ধ। যতদূর মনে হয় এগুলি কোন গ্রন্থে এ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এই অংশের কবিতাগুলি শ্রীসুব্রত রুদ্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

## প্রবাসীর চিঠি

শ্রীমান্ খসরু বাবাজীউ,

"সুবুদ্ধি গোয়ালার কুবুদ্ধি হইল,
ভাঁড়েতে রাখিয়া দুধ পীরকে ফাঁকি দিল
মানিক পীর ভবনদী পার হইবার লা—"
আমার হ'ল তাই ;—
ছিলাম সুখে সিলেট জেলায় ঢুকল মাথায় পোকা
কাণ্ড দেখে বুঝল সবাই লোকটা গবেট বোকা।
বহুত দেশ তো দেখা হ'ল খেলাম মেলাই ঘোল
চোখের জলে ভাসি এখন, খুঁজি মায়ের কোল।
চক্ষু বুজে বসে যখন ভাবি বরদায়
—দেহখানা বদ্ধ ঘরে—দেশপানে মন ধায়
মেলাই ছবি আঁকি, মনের পটে বুলাই তুলি
দুঃখ কষ্ট এই ফিকিরে অনেক কিছুই ভুলি॥
মনে হ'ল আমি যেন পেরিয়ে বছর কুড়ি
ফিরে গেছি সিলেট আবার চড়ি খেয়াল-ঘুড়ী।
বড়দিনের ছুটির সময় নাইব নদীর জলে
বালুর চড়ায় বসে আছি, গামছা নিয়ে গলে।
লাল্লুমিয়ার দোকান থেকে খানিকটা নুন নিয়ে
ডান হাতে কুল, বাঁ হাতে নুন তাই মিলিয়ে দিয়ে
মঞ্চসুধার সৃষ্টি যেন। নাই কিছুরই তাড়া
পরীক্ষা বা অন্য বালাই সামনেও নেই খাড়া।
অলস চোখে দেখছি চেয়ে এপার ওপার যাওয়া
খেয়া নায়ের চিরন্তনী ঢিমে তেতাল বাওয়া।
মহাজনী নৌকা চলে গদাই লশ্‌করি
কমলানেবু বোঝাই করা ; লোভ করে ফস্ করি
গণ্ডা দুয়েক সরিয়ে নেব, কিন্তু চাচা, শোনো

চেষ্টা কভু কোরোনাকো লাভ তাতে নেই কোনো।
ব্যাটারা সব লক্ষ্মীছাড়া খায় না কেন গুলি,
কোনো বাঙাল নেইকো বসে চোখে দিয়ে ঠুলি।
যতই কেন বাড়াও না হাত মহা সন্তর্পণে
ব্যাটারা সব চালাক অতি বৈঠার ঘা অর্পণে।
থাক্ সে কথা, গামছা কাঁধে নাওয়ার বেলা যায়
আবার বলি বন্ধ ঘরে দেশ পানে মন ধায়।
খসরু-পূর্ব[১] বছর সাতেক, বসন্ত কি শীতে,
তোমার মাইজ্‌লা ফুফুর[২] বিয়া হৈল চৌকিতে।
চৌকি আছে নবীগঞ্জের গায়ের সঙ্গে মিশে
সেখান থেকে কই পাঠালেন তোমার মেজ পিসে।
বাপ রে সে কি বিরাট বপু উদর আগুময়
মুখে দিলে মাখন যেন—জঠর ঠাণ্ডা হয়।
তোমার মা তো সেই দেশেরই যেথায় শুনি লোক
মাছ না পেলে ব্যাঙ-ভাজাতে ভোলে মাছের শোক।
শুধালে কি পাবে খবর তুমি তাঁহার কাছে
নউজ বিল্লা[৩]; সত্যি খবর তোমার বাবার আছে।
তামাম জাহান খোদার কাছে সব কিছু নেয় মাগি,
আমার পেটের আঁকুপাঁকু কই মাছেরই লাগি॥
আরো একটা জিনিস খসরু সত্যি তোমায় ব'লি।
যার লাগিয়া তৈরী আমি জানটা দিতে ব'লি।
—ভাবনা শুধু জান্‌টা খাব কেমন করে
পেট আর জান্ তো একই দেহে, আছে একই ঘরে—
তোমার মায়ের দেশের জিনিস বড়ই চমৎকার
অর্ধ জগৎ ঘুরে আমি পাইনি জুড়ি তার—
চোঙ্গা-পিঠা,[৪] আহা চাচা বোলব তোমায় কী?
যখন ভাবি ইচ্ছা হয় যে 'রেজিগ্‌নেশন' দি।
ধ'রে সোজা পয়লা গাড়ী 'দেওর আইলে'[৫] দি ছুট
চাক্‌রি-বাঁধন রাজার শাসন সব কিছু ঝুট্‌মুট।
নামটা সত্যি হলে পরে খাতির পাব মেলা

খানা-পিনা ধুম-ধামেতে কাটবে সারা বেলা।
চোঙ্গা-পিঠার সঙ্গে মলাই দেবে তোয়াজ করে
নয়ত দেবে হরিণ-শিকার হয়ত আছে ঘরে।
করিমগঞ্জের হরিণ সে যে বড়ই খান্‌দানি
খোরাক তাদের আমলকি ফল, ঝরণা-মিঠা পানি।
মহীমিয়ার বাবা ছিলেন বাঘা শিকারী
নুন আর মরিচ সঙ্গে নিয়ে—হাতীর দোয়ারী—
পাহাড় ঘেঁষে চলে যেতেন গভীর বনের পাশ
হরিণ শিকার খেতেন স্রেফ্ ঝাড়া তিনটি মাস।
সঙ্গীবিহীন অন্ধ ঘরে আসন্ন সন্ধ্যায়
সুর্মা নদীর দেশের পানে উদাসী মন ধায়॥
চটছো হয়ত মনে মনে ভাবছ একি হ'ল
চাচার যে সব কাব্যি ছিল সব কিছু আজ ম'ল।
খাবার কথা কয় যে খালি আর কিছু নেই
তাও আছে; তোমার পাতে সন্তর্পণে দেই।
সিলেটের উত্তরেতে সোজা গিয়ে চলে
চৈত্র মাসে, মিঠা রোদে, উজায়ে সুরমা,
গেয়ে সারি, গান—
ধরিয়া পালের দড়ি করিবারে বারুণী'র স্নান
মেলা দৃশ্য দেখিয়াছি।
স্তূপীকৃত ধান মণ মণ
দুই পারে
তার পরে
কী রুপালি ঝিলিমিলি সোনালী ধানের
যেন যে হীরার মালা হাজার হাজার
—কাতার কাতার
হেমাঙ্গীর স্বর্ণবক্ষে।
দীর্ঘ শর্বরীর
শিশিরে করিয়া স্নান এলায়েছে দেহ
আতপ্ত কিশোর রৌদ্রে॥

অগভীর স্বচ্ছ জল
বালুর বুলায় দেহ।
সে জলে ডুবায়ে গা
দেখিয়াছি
তালহীন শব্দহীন মাছের নাচন,
জলের নিচেতে।
উপরেতে নাচে রবিকর
হীরার নূপুর পরে।
হঠাৎ
কেন না জানি—
তলা থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ওঠে ছোট মাছ
কটিখানি কাঁপাইয়া নটরাজ দোলে
জলের উপরে মারে ঘা—
যেন কোন্ খেয়ালী বাদশা
টাকা নিয়ে খেলে ছিনিমিনি।
কখনো বা দেখিয়াছি
দ'য়ে মজে গিয়ে
একপ'ল ছোট মাছ চক্রাকার ঘুরপাক খেয়ে
—গরবা নাচের ছাঁদে—
ইচ্ছা অনিচ্ছায়
অলখ মাদলে মেতে অজানা সে কিসের নেশায়
ক্রমে ক্রমে উঠে উপরেতে ;—
মাছরাঙা স্ট্রুকা ডাইভার
পার্ফেক্ট টাইমিঙ
পড়িল বিদ্যুৎ বেগে হ'ল বজ্রাঘাত।
হুড়মুড় করে
এ ওর ঘাড়েতে পড়ে
মুহূর্তেই হ'ল অন্তর্ধান।
হয়ত বলিতে তুমি
তাতেই বা কী ?

এসবের বর্ণনার কি বা আছে বাকি ?
হক্ কথা
তবু যতবার
বসিয়া বিদেশে
চোখ বুজে মনে করি যেন আমি সুর্মা উজিয়ে
বরদার অবিচার অত্যাচার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
চলিয়াছি
তখনই
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে,
মনে হয় জানি ঠিক জানি আমার দেশের
স্নিগ্ধ শান্ত শ্যামল বনানী
পশ্চাতে তাহার নীলগিরি যবনিকা
তাহার উপরে লিখা
শুভ্রতার শিখা
রূপার ঝরনা
নীলের উপরে সে যে কি বিচিত্র মিনা।
পদমূলে
প্রস্তরে উপলে
কলকল উচ্চহাস্য
হাসিছে খাসিয়া নারী পাঁচশো সাতশো।
মধুরের ধ্যানে আমি বার বার ডুবে
যে রাগিনী দেখিয়াছি চতুর্দিকে যার স্বপ্রকাশ—
কাব্যে ছন্দে রূপ তার মূর্তি আর হ'ল না বিকাশ।
এ কি বিধাতার লীলা ?
রূপে গন্ধে রসে শ্বাসে পরিপূর্ণ এ রমণী হ'ল মূক শিলা
তাই কি শিলেট ?
কাব্যে তার মাথা হেঁট !
কিন্তু চাচা মাফ করো, আজ কাজ আছে মোর মেলা
কাব্য-সাগর যেদিক পানে যায়নি জীবন-ভেলা—
চড়ায় লেগে আটকে আছে জোয়ার নাহি আসে

পূব হাওয়াও দেয়নি ঠেলা নৌকা নাহি ভাসে।
আগাগোড়া ভুলে ভরা জগা-খিচুড়ি
বয়স হ'ল হিসেব করে দেখি যে দুই কুড়ি।
চহল্ সালে উম্‌রে আজীজম্ গুজশৎ[৬]
কালাপানির গারদ মাঝে ভালে হানি দণ্ড।[৭]
তাই বলি
সুবুদ্ধি গোয়ালার কুবুদ্ধি হইল
ভাঁড়েতে রাখিয়া দুধ পীরকে ফাঁকি দিল
মানিক পীর ভবনদী পার হইবার লা।
সেই পীরেরে স্মরণ করে তোমার ছোট চাচা॥

মৌচাক, কার্তিক ১৩৬০

---

১. খসরু-পূর্ব—খৃষ্টপূর্বের তুলনায়, অর্থাৎ খসরুর জন্মের বছর সাতেক পূর্বে।

২. মেজো পিসী।

৩. তওবা, তওবা।

৪. বাঁশের চোঙার ভিতর চাল ভরে সেই চোঙা আগুনে ঝল্‌সে তৈরী এক রকম পিঠে।

৫. 'দেওর আইল' অর্থাৎ 'দেবর এল', খসরুর মামার গ্রামের নাম।

৬. ইরানি কবি সাদীর বিখ্যাত ছত্র। 'আমার জীবনের প্রিয় চল্লিশ বৎসর গেল, কিন্তু এখনো ছেলেমানুষী গেল না।' খসরু তখন ফার্সী শিখছিল বলে ছত্রটি তোলা হয়েছে।

৭. হাত।

## ক্রিকেট

হুজুগে মেতে ক্রিকেট খেলা দেখিতে যদি চাও
মাথাটি মোর খাও—
গাড়োল-পানা প্রশ্ন মেলা ঝেড়ো না খালি খালি
খেলাটা যদি না বোঝো তবে দিয়ো না হাততালি
এলোপাতাড়ি বেগার-মোকা ক্যাবলা হাবার মত।
রয়েছে শত শত।
কায়দা-কেতায় ওকীব-হাল খেলার সমঝদার
শুধিয়ো নাকো' ওদের মিছে প্রশ্ন বেশুমার।
শুধাও যদি মানা না শুনে, কি হবে ফল, বলি,
ট্যারচা-মুখো জবাব দিয়ে থামাবে চলাচলি।
যেমন ধরো, জানো না কিছু, শুধালে ভয়ে ভয়ে
যে গুণী পাশে আছে বসে—"দিন তো মোরে কয়ে,
কাঠের ঐ ডাণ্ডাগুলো, কি নাম হয় তার ?"
পাশের যিনি হইবে মনে রাগত হন যেন
ঘ্যানরঘ্যান লাগিবে ভালো কেন !
বলেন তিনি মিনিট তিন থাকিয়া নিশ্চুপ
"উকেট কয়"। গলাতে যেন রয়েছে বিদ্রূপ।
হকচকিয়ে দিলে তো তুমি অনেক ধন্যবাদ ;
খানিক পরে তবুও মনে হইল তব সাধ
এলেম নব হাসিল লাগি। কিন্তু তাতে ভয়
তেড়ে না যান এবার তিনি—গুণী তো নিশ্চয়—
থাকিয়া চুপ, ভাবিয়া খুব, গলাটি সাফ করে
চুলকে ঘাড় শুধালে মৃদু স্বরে
"উকেট কয় ? বেশক্ কথা ; লেকিন্ কন্ স্যার
ওসবগুলো হোথায় কেন কি হয় উপকার ?"

কটমটিয়ে এবার গুণী তাকান তব পানে
বাসনা যেন প্রাণটি তব হানেন আঁখি-বাণে—
হুঙ্কারিয়া হাঁকেন শেষে, "ওগুলো কার তরে ?—
খেলাড়ি সব বসবে বসে ক্লান্ত হলে পরে।"

মৌচাক, বৈশাখ ১৩৬৭

বছর দুই পূর্বে আমি যখন ঢাকাতে আমার ছোট বোনের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম, তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। আমার ভগ্নী আস্‌মা ঘড়িঘড়ি রেডিয়ো খুলে লেটেস্ট স্কোর শুনে নিচ্ছিল। আমি দু' একটি প্রশ্ন শুধিয়েই বুঝে গেলুম আস্‌মা ক্রিকেটতত্ত্বে একদম অগা, অর্থাৎ আমার চেয়েও কম ক্রিকেট খেলা বোঝে। এ কবিতাটি তারই উদ্দেশে ; এবং যেহেতু 'কবিতাটি' ঢাকায় রচিত তাই ঢাকাই বিদেশী শব্দ একটু বেশী রয়েছে।

## প্রদীপের তলাটাই অন্ধকার কেন ?

পিলসুজ 'পরে হেরো জ্বলে দীপশিখা,
চতুর্দিকে যে আঁধার ছিল পূর্বে লিখা
মুহূর্তেই মুছে ফেলে।
কিন্তু অতি অবহেলে
'মাভৈঃ' বলিয়া তারে ছেড়ে দেয় স্থান
যে আঁধার পায়ে ধরে মাগে পরিত্রাণ।

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৬৯

---

যথা—বেগার-মোকা/বেমক্কা, খামকা, যত্রতত্র।
ওকীবহাল/বিশেষজ্ঞ, Specialist
বেশুমার/অসংখ্য
বে/Without
শুমার/Number, আদমশুমারী তুলনীয়
এলেম হাসিল/নবজ্ঞান লাভ
বেশক/দ্বিধাহীন, অসংশয়
লেকিন্/কিন্তু

## উচ্ছে ভাজা সন্দেশ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে, ইস্কুলের, এমন কি কলেজের গোড়ার দিকেও ছেলেমেয়েদের শেকসপীয়র পড়ানো উচিত নয়। কারণ শেকসপীয়রের ভাষা প্রাচীন দিনের। সে ভাষার অনেক শব্দ, অনেক ইডিয়ম আজকের দিনের ইংরেজিতে আর ব্যবহার করা হয় না। ছেলেমেয়েরা সেটা না বুঝতে পেরে সেগুলো আপন লেখাতে লাগিয়ে দিয়ে একটা খিচুড়ি ভাষা তৈরী করে বসে। উচিত : প্রথম আধুনিক ইংরেজিটা শিখে নেওয়া এবং তার পর শেকসপীয়র ইত্যাদি ক্লাসিকস্ পড়া। নিজের থেকেই ছেলেমেয়েরা অনুভব করবে কোন্‌টা প্রাচীন দিনের শব্দ, এখন আর চলে না।

আমার মনে হয় বাঙলার বেলায়ও এখন সেই অবস্থা। ধরে নিলুম, তোমার বয়স বারো-চোদ্দো। তুমি যদি বিস্তর বঙ্কিম পড়ো তবে বাঙলা লেখার সময় তুমি এমন ভাষা শিখবে যেটা আজকের দিনে পণ্ডিতী-পণ্ডিতী, গুরুগম্ভীর মনে হবে। তাই আমার মনে হয়, এই বয়সে, রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের লেখা বার বার পড়ে সেটা আয়ত্ত করে নেওয়া। আয়ত্ত করার অর্থ এ নয় যে তখন তুমি তাঁর মতো লিখতে পারছো। তা হলে তো আর কোনো ভাবনাই ছিল না। আমরা সবাই গণ্ডায় গণ্ডায় নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতুম। তার অর্থ, তুমি মোটামুটি জেনে গেছ, কি কি শব্দ কোন্ কোন্ ইডিয়ম ব্যবহার করলে কেউ বলতে পারবে না এগুলো প্রাচীন দিনের, এখন আর চলে না। এটা হয়ে যাওয়ার পর পড়বে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের লেখা। বিশেষ করে তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য'। কিন্তু সেটা খুব সহজ নয়। আমি একটি ছত্র তুলে দিচ্ছি : 'একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয় দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হ'ত, তবে সেই পঞ্চবীর-পতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।' কঠিন বাঙলা। কিন্তু কী সুন্দর! কী মধুর!!

তারপর বঙ্কিম। বিদ্যাসাগর। কালীপ্রসন্নের মহাভারত। এবং সর্বশেষে 'আলালের ঘরে দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। তারও পরে যদি নিতান্ত কোনো-কিছু না থাকে, বৃষ্টির দিন, বাড়ির থেকে বেরনো যাচ্ছে না, তবে পড়বে—বড় অনিচ্ছায় বলছি—সৈয়দ মুজতবা আলী। কিন্তু তিন সত্য দিয়ে বলছি, পয়সা খরচ করে না। ধার করে।

এ গল্পটা তো জানো? মার্কিন লেখক মারক টুয়েনের আপন লাইব্রেরিখানা নাকি সত্যিই দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকতো—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মারক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গুটাকয়েক শেল্‌ফ যোগাড় করছো না কেন?'

মারফ টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে-কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেল্‌ফ তো আর সে-কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে? শেল্‌ফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

উপদেশ দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম। সেটা তেতো। উচ্ছে ভাজা। কিন্তু সন্দেশ দিয়ে শেষ করলুম তো!

## ক্লাইন এর্না

ক্লাইন এর্না জরমনির ছোট্ট একটি মেয়ে। আমাদের যে-রকম গোপালভাঁড় দারুণ চালাক, এই মেয়েটি সে-রকম ভীষণ বোকা। তবে, মাঝে মাঝে সে এমন কথা কয় যে তার উত্তর মেলা ভার। যেমন ধরো, এর্নার মা বলছে, "হেই ক্লাইন এর্না! বেড়ালের ন্যাজটা মিছে মিছে টানছিস কেন?" এর্না বললে, "আমি টানছি কোথায়? কি যে বলো মা! বেড়ালটাই তো খালি খালি টানছে। আমি তো সুদ্দু ন্যাজটা ধরে আছি।"

"ক্লাইন" মানে ছোট, ক্ষুদে। কিন্তু কারো কারো নাম বড় হয়ে যাবার পরও "ছোট" থেকে যায়। আমাদের দেশেও তাই। বাড়ির বড় বড় কর্তারা সব ওপারে চলে গিয়েছেন, কিন্তু "ছোট (ক্লাইন) বাবুর" নাম "ছোট বাবুই" রইল।

ক্লাইন এর্নার বেলাও তাই। আর এ-গল্পটা আমার বিশেষ করে ভালো লাগে, কারণ গল্পটা আমাদের দেশেও চালু আছে।...ক্লাইন এর্নার তখন একটুখানি বয়স হয়েছে। ইস্কুলে "বয়-ফ্রেণ্ড" জুটেছে। সে বললে, "চলো ক্লাইন এর্না। নৌকো ভাড়া করে আমরা ঐ হোথাকার চর হেলিগোলাণ্ডে যাই। দু'তিন টাকা লাগবে। সে আমার আছে। কি বলো? লক্ষ্মীটি, না বলো না।"

আমাদের ক্লাইন এর্না সত্যি লক্ষ্মী মেয়ে। "না" বলবে কেন? তদ্দণ্ডেই রাজী হয়ে গেল।

নৌকো ভাড়া করে বন্ধু শুধোলো, "ক্লাইন এর্না, তুমি দাঁড় ধরতে পারো? আমি তা হলে বৈঠে বাই। নইলে—"

ক্লাইন এর্না বাধা দিয়ে বললে, "দাঁড় ধরতে পারবো না কেন? বাবার সঙ্গে কতবার নৌকোয় করে মাছ ধরতে গিয়েছি।"

ঘণ্টাখানেক বৈঠে ঠেলার পর ফ্রেণ্ড বললে, 'ক্লাইন এর্না, এক ঘণ্টা তো হয়ে গেল। এখনো হেলিগোলাণ্ডে পৌছলুম না কেন? ওটা তো দেখাও যাচ্ছে না।"

ক্লাইন এর্না বললে, "অ। তাই বুঝি। আম্মো তো খেয়াল করিনি। নৌকো যে পাড়ের খুঁটিতে এখনো বাঁধা। আমি খেয়ালই করিনি।"

আমাদের দেশেও বলে, "পুরা রাইত নাও বাইয়া দেখি, বাড়ির ঘাটেই আছি।" এর আসল অর্থ: মোদ্দা, সব চেয়ে যেটা প্রয়োজনীয়, সেটা আগে না করলে বাদবাকি পণ্ডশ্রম।

## বিদেশী ভাষা—ক্লাইন এর্না

স্বর্গত সুকুমার রায় একদা বলেছিলেন, "কেই বা শোনে কাহার কথা, কই যে দফে দফে—গাছের পর কাঁঠাল দেখে তেল দিয়ো না গোঁফে।" অর্থাৎ মানুষ উপদেশ শুনতে মোটেই ভালোবাসে না। বিশেষ করে যারা ছেলেমানুষ। নিজের কথা যদি তুলি তবে নির্ভয়ে, কিন্তু ঈষৎ লজ্জা সহ বলবো, আমি যখন ছেলেমানুষ ছিলুম তখন কারোরই কোনো উপদেশে কান দিতুম না। একমাত্র মায়ের আদেশ উপদেশ—তা সে-কথা বাদ দাও, এখনো, এই পরিপক্ক বৃদ্ধ বয়সে আমার চোখে জল আসে। হ্যাঁ, কি বলছিলুম? বলছিলুম কি, তাই উপদেশ দিতে আমার বড়ই অনিচ্ছা। কিন্তু আজ কিছুটা দিতেই হচ্ছে। খুলে বলি। পরশু দিন আমার প্রতিবেশী একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে আমায় শুধোলে, "স্যর, এটা কি সত্য, ইউ অ্যাণ্ডারস্টেণ্ড টুয়েনটি ল্যাঙগুজেস?" আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, "সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। আই মিসআণ্ডারস্টেণ্ড মোর দেন টুয়েনটি ল্যাঙগুজেস।" এর থেকেই বোঝা যায় যে, এ-পাড়ায় আমার বদনাম আছে, আমি নাকি একাধিক ভাষা জানি। তাই ইংরেজি শেখা সম্বন্ধে দু'একটি কথা এই সুবাদে বলে নিতে চাই। মাস্টারমশাইরা সর্বদাই বলে থাকেন, যে বই পড়বে

তার কোনো শব্দ জানা না থাকলে অভিধান খুলে দেখে নেবে। এটা অবশ্যই টেকস্‌ট্‌ বই সম্বন্ধে খাটে। কিন্তু ভেবে দেখো তো, তুমি যে সব কঠিন বাঙলা শব্দ শিখেছ, তার ক'টি অভিধান দেখে? যে-সব বাঙলা গল্প উপন্যাস ভ্রমণ-কাহিনী পড়েছো তাতে বার বার কঠিন শব্দ এখানে, ওখানে, সেখানে ঘুরে ফিরে এসেছে এবং তারই ফলে শব্দগুলোর সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় হয়ে গিয়েছে। ইংরেজির বেলাও এই পদ্ধতি প্রযোজ্য।...এবং এই "রেপিড রীডিং" জিনিসটি আরম্ভ করবে শারলক হোমস, আগাথা ক্রিসটি ইত্যাদির ডিটেকটিভ নভেল দিয়ে। সেগুলো এমনই ইন্‌টরেসটিং যে, হেসেখেলে বইয়ের শেষ পাতায় পৌঁছে যাবে। যতক্ষণ অবধি গল্পটা বুঝতে পারছো, ততক্ষণ অভিধানের কোনো প্রয়োজন নেই। এ-সম্বন্ধে আরো অল্পবিস্তর বলার আছে। উপস্থিত ভাষা নিয়ে আমাদের ক্লাইন এর্নার একটা গল্প মনে এল।...ক্লাইন এর্না বিয়ে করেছে এক ইংরেজকে, কিন্তু হায়, এক বছর যেতে না যেতে তার বর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তারপর তার একটি বাচ্চা হল। কিন্তু হায়, হায়, ছ'দিনের দিন বাচ্চাটি মারা গেল। বেচারীর কী কান্না, কী কান্না। তার মা তাকে অনেক প্রবোধবাক্য শোনানোর পর শেষটায় বললে, "আর ছাখ, ক্লাইন এর্না, বাচ্চাটার বাপ তো ইংরেজ। মুখে কথা ফুটতেই সে ইংরেজি বলতো। আমি তো ইংরেজি জানিনে। দিদিমা হয়ে তার এক বর্ণও বুঝতে পারবো না—সেটা কি খুব ভালো হত?"

## ক্লাইন এর্না

২

ক্লাইন এর্না গোয়ালঘরের সামনে বসে হোম-টাস্ক লিখছে। এমন সময় তার আদরের গাইটি পাশে এসে দাঁড়িয়ে শুধলো, কি লিখছো, ক্লাইন এর্না?

চুলোয় যাক্‌। মোটর গাড়ি সম্বন্ধে লিখতে বলছে। আমার মাথায় কিছু আসছে না।

গোগম্ভীর কণ্ঠে গাই বললে, আমি বলে যাই, তুমি লেখো। মোটরগাড়ি অবিশ্বাস্য অদ্ভুত জানোয়ার। এদের বিকট বিকট দুটো দারুণ উজ্জ্বল চোখ থাকে। কিন্তু সে-দুটো শুধু রাতের অন্ধকারেই জ্বলে ওঠে।...এরা যখন রাস্তার উপর দিয়ে হুশ হুশ করে যায় তখন সম্পূর্ণ অচেনার মত একে অন্যের দিকে কোনো খেয়াল না করে চলে যায়। কিংবা দুম করে একে অন্যকে মারে মরণ-ধাক্কা। তখন দুজনাই মারা যায়। আশ্চর্য, এদের কোনো মধ্যপন্থা বা তৃতীয় পন্থা নেই।...এরা নিজেদের

খাবার যোগাড় করতে পারে না। মানুষই এদের জল তেল আরো কি যেন খেতে দেয়। আমার আশ্চর্য লাগে, ওরা মুখ দিয়ে ও অন্য দিক দিয়ে, দু দিক দিয়েই খায় কি প্রকার!...লোকে ভাবে, ওরা খুব তীব্রগতিতে চলতে পারে। আদৌ না। ঐ সেদিন আমার এক বান্ধবী রাস্তা দিয়ে আপন গোয়ালে ফিরছিল। পিছন থেকে, অনেকক্ষণ ধরে ওদেরই একজন কোঁক-কোঁক, কোঁক-কোঁক করে চিৎকার করছিল, কিন্তু এগিয়ে যেতে পারছিল না। অবশেষে আমার বান্ধবী যখন বাঁ-দিকে মোড় নিয়ে তার বেডরুমে পৌঁছে গেল তখন বাবু এগোলেন।...ওরা রাস্তায় যা ফেলে যান সেটা ঘুঁটেকুড়োনি ঘৃণার চোখে দেখে।...শেষ প্রশ্ন ওরা কি মোটেই কোনো বন্ধু-বান্ধব চায় না? সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওদেরই একজন রাস্তার পাশের কাঁটার বেড়া ভেঙে আমাদেরই মাঠের মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালেন। ওর সঙ্গী-সাথী মানুষরা ওকে ফেলে চলে গেল। আমি ভাবলুম, আহা বেচারী, একা একা রাত কাটাবে। একটুখানি সঙ্গ দিই। কোনো সাড়া পেলুম না। তখন দেখি ওর চোখ দুটোও জ্বলছে না। পরদিন সকালবেলা এল তার মা। বিরাট দেহ। দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে নিয়ে চললো শহরপানে। আমি যখন তার মা'র সামনে দাঁড়িয়ে—নমস্কার, আসুন তবে, বললুম, তখন তিনি সুপ্রসন্ন কোঁক-কোঁক বলে উত্তর দিলেন। মা-টি মেয়ের চেয়ে ঢের ঢের ভদ্র।

## গুরুদেব

প্রমথ চৌধুরীর মত মনীষী যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা অনবদ্য ভাষায় লেখেন, তখন তা পড়ে আমরা বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথের বিপুল ব্যক্তিত্বের গৌরব এবং মহিমা তিনি পরিপূর্ণ ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাবের গভীরতা, চিন্তার ঐশ্বর্য এবং রবীন্দ্র-জীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে আমরা নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারি।

আমার লেখাও সফল হত যদি আমি কবি বা স্রষ্টা হতুম। কবির দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনাই হোক, আর তাঁর কাব্যালোচনাই হোক কিঞ্চিৎ সৃজনী-শক্তি না থাকলে সে-রচনা কবির বিরাট ব্যক্তিত্বের পটভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়ে শুধু বৈচিত্র্য-হীনতার পরিচয়ই দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখতে আমার বড় সঙ্কোচ বোধ হয়। ভয় হয়, যত ভেবেচিন্তেই লিখি না কেন বিদগ্ধজনেরা পড়ে বলবেন,

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষালাভ করেও এই ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচয় পেল না। এই অভিমত যে নিদারুণ সত্য তা আমি জানি ; তাই স্থির করেছিলুম যে, কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথকে যে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে সহজ, সরলভাবে পেয়েছিলুম, সে-কথা একেবারে অপ্রকাশিতই রাখব।

কিন্তু মুশকিল হ'ল এই যে,—কবি-প্রণামের রচনা-সংগ্রাহকগণ ও আমার নিজের দেশ 'শ্রীহট্টে'র অনেকেই জানেন যে, আমি শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেছি। এই সঞ্চয়িতার মধুকর যে আমার লেখা চেয়ে আমাকে পরম সম্মানিত করেছেন, তার একমাত্র কারণ তিনি জানেন যে, আমি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য ; তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। কিন্তু আমার দেশবাসী প্রিয়জনকে কি করে বোঝাই যে, রবীন্দ্রনাথের ঘরের দেয়াল, আসবাব তাঁকে আমার চেয়ে ঢের বেশী দেখেছে। আপনারা বলবেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বাদ দাও, তাঁর কাব্য আলোচনা কর। উত্তরে আমি বিনীতভাবে বলতে চাই—সে তো সহজ কর্ম নয়।...তবে আর কিছু না হোক্, এ আমি নিশ্চয় করে জানি যে, আমার মনোজগৎ রবীন্দ্রনাথের গড়া। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলুন, দর্শন, কাব্য, ধর্মের ভিতর দিয়ে বহুর মধ্যে একের সন্ধান বলুন ; কালিদাস, শেলি, কীট্‌সের কাব্যের ভিতর দিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের রসাস্বাদই বলুন—আমার মনোময় জগৎ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। জানা-অজানায় পঠিত—আমার চিন্তা, অনুভূতির জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। জীবনের ক্রমবিকাশ-পথে নানা দিক থেকে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু, সেই কাব্য-সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ কতটুকুই বা আমি করতে পারি ? তাই এতদিন সে চেষ্টা করিনি। কিন্তু 'দেশে'র ডাকে তো নীরব থাকতে পারলাম না। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় আমার অক্ষমতা-নিবন্ধন যা আমি করতে পারিনি, আজ তাঁর জীবনান্তে সেই ব্রত উদ্‌যাপন করতে ব্রতী হয়েছি।

একথা তো ভুলতে পারিনে যে, একদিন তাঁর চরণপ্রান্তে বসে আশীর্বাদ লাভ করেছি, তাঁর অজস্র অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ধন্য হয়েছি—সেই অপরিমেয় স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য। তাই আজ অশ্রুসজল চিত্তে সকলের সঙ্গে কবিগুরুকে আমারও সম্মিলিত প্রণাম নিবেদন করছি।

* * *

১৯২৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দর্শন' পড়তে যাই। বিদ্যালয়ের বিশাল প্রাসাদে পথ ভুলে 'ফনেটিক ইনস্‌টিট্যুটে'র বক্তৃতাগৃহে উপস্থিত হই। বহু ছাত্র-

ছাত্রী ভিড় করে বসে আছে—বক্তৃতা শুরু হবার দেরি নেই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি দেশবাসী কেউ নেই। ভয়ে ভয়ে বসে পড়লুম। প্রোফেসার বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, "অন্তকার বক্তৃতা ফনেটিক বিজ্ঞানের অবতরণিকা। নানা ভাষায় নানা দেশের লোকের নানা উচ্চারণ আজ শোনানো হবে।" ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে দেয়ালে ম্যাজিক লেণ্টর্নের ছবি ফেলা হল।...রবীন্দ্রনাথ!... সঙ্গে সঙ্গে কলের গানে বেজে উঠল সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর :

Through ages India has sent her voice—অন্ধকার ঘরে রবীন্দ্রনাথের ঋজুদীর্ঘ মূর্তির আলোকোদ্ভাসিত প্রতিচ্ছবি। কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথের—না তপোবনের ঋষির—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে',—ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন বাণী।

আবার আলো জ্বলল। অধ্যাপক বললেন, এমন গলা, ঠিক জায়গায় জোর দিয়ে অর্থ প্রকাশ করার এমন ক্ষমতা শুধু প্রাচ্যেই সম্ভব। পূর্বদেশে মানুষ এখনো "বট"কে (শব্দব্রহ্ম) বিশ্বাস করে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে তারই পূর্ণতম অভিব্যক্তি। কণ্ঠস্বরের এমন মাধুর্য, বাক্যের এমন ওজস্বিতা পশ্চিমে কখনও হয় না।

গর্বে আমার বুক ভরে উঠল। ডাইনে তাকালুম, বাঁয়ে তাকালুম। ভাবটা এই, "আলবৎ, ঠিক কথা, ভারতবাসীই শুধু এমন ধ্বনির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারে।" ক্লাসের বহু ছাত্রছাত্রী সে সন্ধ্যায় আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি মাথা উঁচু করে বসেছিলুম। আমার গুরুদেব ভারতবর্ষের, আমিও ভারতবাসী।

* * *

তার চেয়েও আশ্চর্য হয়েছিলুম ১৯২৭ সালে—জর্মনী যাওয়ার দুই বৎসর পূর্বে—কাবুলে।

ইউরোপ যাওয়ার জন্য অর্থ-সংস্থান করতে গিয়েছিলুম কাবুলে। ফরাসী ও ফারসী জানি বলে অনায়াসে চাকরি পেয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিশ্বভারতীই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে ফরাসী, ফারসী, জর্মন একসঙ্গে শেখা যেত।

দু'শো টাকা মাইনেতে গিয়েছিলুম; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কাবুল সরকার আবিষ্কার করলেন যে আমি জর্মনও জানি। মাইনে ধাঁ করে একশো টাকা বেড়ে গেল। পাঞ্জাবী ভায়ারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওজীরে মওয়ারীফের (শিক্ষামন্ত্রী) কাছে ডেপুটেশন নিয়ে ধরণা দিয়ে বললেন, সৈয়দ মুজতবা এক 'অনরেকগনাইজড্' বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী। আমরা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ; এম. এ। আমাদের মাইনে শ-দেড়শো; তার মাইনে তিনশো, এ অন্যায়।

শিক্ষামন্ত্রীর সেক্রেটারী ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি আমার কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করেছিলেন ফারসীতে।*—"জানো, বন্ধু, শিক্ষামন্ত্রী তখন কি বললেন?" খানিকক্ষণ চুপ করে জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বললেন—"বিলকুল ঠিক! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, তোমাদের ডিগ্রীতে দস্তখত রয়েছে পাঞ্জাবের লাটসাহেবের। তাঁকে আমরা চিনি না, দুনিয়াতে বিস্তর লাটবেলাট আছেন—আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্তানেও গোটাপাঁচেক লাট আছেন। কিন্তু মুজতবা আলীর সনদে আছে রবীন্দ্রনাথের দস্তখত,—সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি সমগ্র প্রাচ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।"

* * *

এসব অভিজ্ঞতা যে কোনোদিন হবে সে তো স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, যখন ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাই। বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগ তখনও খোলা হয়নি। ছ'মাস পরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পৌরোহিত্যে তার ভিত্তি-পত্তন হয়। বিশ্বভারতীতে তখন জনদশেক ছাত্রছাত্রী ছিলেন; তাঁরা সবাই শান্তিনিকেতন স্কুল থেকেই কলেজে ঢুকেছেন—শ্রীহট্টবাসীরূপে আমার গর্ব এই যে বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে আমিই প্রথম বাইরের ছাত্র।†

প্রথম সাক্ষাতে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, কি পড়তে চাও?

আমি বললুম, তা তো ঠিক জানিনে তবে কোনও একটা জিনিস খুব ভাল করে শিখতে চাই।

তিনি বললেন, নানা জিনিস শিখতে আপত্তি কি?

আমি বললুম, মনকে চারদিকে ছড়িয়ে দিলে কোনও জিনিস বোধ হয় ভাল করে শেখা যায় না।

গুরুদেব আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, একথা কে বলেছে?

আমার বয়স তখন সতেরো,—থতমত খেয়ে বললুম, কনান ডয়েল।

গুরুদেব বললেন, ইংরেজের পক্ষে এ বলা আশ্চর্য নয়।

কাজেই ঠিক করলুম, অনেক কিছু শিখতে হবে। সম্ভব অসম্ভব বহু ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। গুরুদেবের সঙ্গে তখন সাক্ষাৎ হত ইংরেজি ও বাংলা ক্লাসে। তিনি শেলি, কীটস আর 'বলাকা' পড়াতেন।

---

* ("খী দানীদ আগাজান, ওজীরে মওয়ারিফ্ চি গুফতন্দ")

† রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি ১৯১৯ ইং-এ শ্রীহট্ট শহরে। পূজ্যপাদ ৺গোবিন্দনারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে তিনি শ্রীহট্টের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন।

তারপর ১৯২২-এর কাছাকাছি শান্তিনিকেতনে টলস্টয়ের ভাবধারা হঠাৎ ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করল। আমরা বললুম, শান্তিনিকেতনে আমরা যে জীবনযাপন করছি সেটা বুর্জুয়া জীবন, বিলাসের জীবন। তাতে সরলতা নেই, সাম্য নেই, স্থৈর্য নেই। আমাদের উচিত সেই সহজ সরল জীবনকে ফিরিয়ে আনা, মাটির টানে প্রকৃতির কোলে ফিরে গিয়ে ক্ষেত করা, ফসল ফলানো। আমাদের মতবাদ যখন প্রবল হয়ে বিদ্রোহের আকার ধরেছে, তখন একদিন গুরুদেব আমাদেরে ডেকে পাঠালেন। আমাদের মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি তর্ক করলেন। নাস্তানাবুদ হয়ে আমরা আধঘণ্টার ভেতর চুপচাপ। সবশেষে তিনি বললেন, আমি জানি একতারা থেকে যে সুর বেরোয় তাতে সরলতা আছে কিন্তু সে সরলতা একঘেঁয়েমির সরলতা। বীণা বাজানো ঢের শক্ত। বীণাযন্ত্রের তার অনেক বেশী, তাতে জটিলতাও অনেক বেশী। বাজাতে না জানলে বীণা থেকে বিকট শব্দ বেরোয় কিন্তু যদি বীণাটাকে আয়ত্ত করতে পার তবে বহুর মধ্যে যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয় (হারমনি ইন্ মল্‌টিপ্লিসিটি) তা একতারার একঘেঁয়েমির সরলতার (মনটনস্ সিম্‌প্লিসিটি) চেয়ে ঢের বেশী উপভোগ্য। আমাদের সভ্যতা বীণার মত, কিন্তু আমরা এখনও ঠিকমত বাজাতে শিখিনি। তাই বলে সে কি বীণার দোষ, আর বলতে হবে যে একতারাটাই সব চেয়ে ভালো বাদ্য যন্ত্র।

আমার মনে হয় এইটেই ছিল রবীন্দ্রনাথের মূল সুর। চিরজীবন তিনি বহুর ভেতর একের সন্ধান করেছিলেন। তাঁর সে সাধনা আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। সৌভাগ্যক্রমে প্রায় এক বৎসর শান্তিনিকেতনে আমি ছিলুম এক ঘরের নীচের তলায়। সেখান থেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেই দেখতে পেতুম, গুরুদেব তাঁর জানালার পাশে বসে লেখাপড়া করছেন। সকালে চারটার সময় দুঘণ্টা উপাসনা করতেন। তারপর ছটার সময় স্কুলের ছেলেদের মত লেখাপড়া করতেন। সাতটা আটটা, নটা, তারপর দশ মিনিটের ফাঁকে জলখাবার। আবার কাজ—দশটা, এগারোটা, বারোটা। তারপর খেয়েদেয়ে আধঘণ্টা বিশ্রাম। আবার কাজ—লেখাপড়া; একটা, দুটো, তিনটে, চারটা, পাঁচটা—কাজ, কাজ, কাজ। পাঁচটা থেকে সাতটা ছেলেমেয়েদের গান শেখাতেন—বা দিনুবাবুর আসরে বসে গান শুনতেন, অথবা গল্প-সল্প করতেন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে আবার লেখাপড়া, মাঝে মাঝে গুন গুন করে গান—আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত। কী অমানুষিক কাজ করার ক্ষমতা! আর কী অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা!

আমি তখন নিতান্তই তরুণ। আমার থেকে যাঁরা প্রবীণ এবং জ্ঞানী তাঁরা

গুরুদেবের জীবনের অনেক ইতিহাস জানেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নানা সৃষ্টির নানা আলোচনা করবেন। তাঁর সৃষ্টির অনেক কিছু অমর হয়ে থাকবে, অনেক কিছু লোপ পাবে।

কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, চিরন্তন হয়ে থাকবে রবীন্দ্রনাথের গান। জর্মনীর 'লীডর' গান য়ুরোপের গীতিকাব্যের মধ্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধ একথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না। এমন সব গান 'লীডরে' আছে যার কথা দিয়েছেন গ্যেটের মত কবি আর সুর দিয়েছেন বেটোফেনের মত সুনিপুণ সুর-শিল্পী। আমার মনে হয়, তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গান। কারণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একাধারে গীতিকার এবং সুরস্রষ্টার প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালীর কণ্ঠে চিরকাল বেঁচে থাকবে। কেউ যদি বলেন, না, চিরস্থায়ী তা হবে না,—আমি তর্ক করব না। কারণ আর যা নিয়ে চলুক ; গান নিয়ে, গীতি-কবিতা নিয়ে তর্ক চলে না। গানের আবেদন সরাসরি একেবারে মানুষের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। গান হৃদয়কে দোলা দেয়, অন্তরে জাগায় অনির্বচনীয় অনুভূতি ;—যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বললাম। সে-বিপুল সাহিত্যের খানিকটা বুঝেছি, বেশীর ভাগই বুঝি নি। কিন্তু, তাঁর সাহিত্যালোচনার দিন আজ নয়। আজ শুধু আমার স্নেহপ্রবণ গুরুদেবের সংবেদনশীল অন্তরটির পরিচয় দেবার জন্যেই আরো কয়েকটি কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, ধরা-ছোঁয়ার অতীত ; সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি যে ছিলেন স্নেহাসক্ত গুরু, নিতান্তই মাটির মানুষ। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করাও যে দুঃসাধ্য। হিমালয়ের পাদমূলে বসে বিচিত্র পুষ্প চয়নকালেও ক্ষণে ক্ষণে গৌরী-শিখরের বিরাট, বিশাল, গম্ভীর মহিমা হৃদয়কে নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে অবসর সময়ে ক্যাটালগ তৈরি করতুম। তখন প্রতিদিন দেখতুম পাঠান্তে নূতন পুরাতন বই তিনি লাইব্রেরীতে ফেরত পাঠাতেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, কাব্য, কত বলব। এমন বিষয় নেই যাতে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল না।

এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন আজীবন জ্ঞান-সাধক। কিন্তু তাই বলে জীবনকে সকল দিক থেকে বঞ্চিত করে কঠোর জ্ঞানমার্গ তিনি অবলম্বন করেননি। তিনি তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন—"ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে

নহে আমার"—পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী। এক হিসেবে তিনি ছিলেন প্রকৃত তপস্বী। তপস্যা;—সে তো শক্তি সঞ্চয়ের জন্যেই। তাঁর একটি কবিতায় আছে—

"জানি জানি এ তপস্যা দীর্ঘ রাত্রি
করিছে সন্ধান,
চঞ্চলের মৃত্যুস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ জীবনে অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর ঋষি-দৃষ্টির সমক্ষে সত্যের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল পরিপূর্ণ মহিমায়। তারি পরিচয় তাঁর অজস্র গানে, কবিতায়, 'ধর্ম' এবং 'শান্তিনিকেতনে'র নিবন্ধগুলোতে। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান শুধু পুঁথি-পড়া জ্ঞান নয়, তা সম্পূর্ণই অনুভূতির।

'মহুয়া' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ নিজে চয়ন করে 'সঞ্চয়িতা' প্রকাশ করেন। তাতে 'মহুয়া'র অতি অল্প কবিতা স্থান পায়। তখন রব উঠেছে 'মহুয়া'তে কবির সৃজনী-শক্তির অপ্রাচুর্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ভয় হল, রবীন্দ্রনাথও বুঝি তাই বিশ্বাস করে 'মহুয়া'র যথেষ্ট কবিতা 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান দেন নি। কলকাতায় থাকতুম; শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি 'সঞ্চয়িতা'তে 'মহুয়া'র আরো কবিতা দিলেন না কেন? আমাকে যদি 'সঞ্চয়িতা' সম্পাদন করার ভার দেওয়া হত, আমি তাহলে 'মহুয়া'র মলাট ছিঁড়ে 'সঞ্চয়িতা' নাম দিয়ে প্রকাশ করতুম। বলতুম, এতেই সব চাইতে ভালো কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

গুরুদেব হেসে বললেন, ভাগ্যিস তোমাকে 'সঞ্চয়িতা' তৈরি করবার ভার দেওয়া হয়নি। আমি 'মহুয়া'র কবিতা 'সঞ্চয়িতা'তে যে বেশী প্রমাণে দিইনি, তার কারণ এই যে 'মহুয়া'র কাব্য-সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। আসলে 'মহুয়া'র কবিতাগুলি মাত্র সেদিনের লেখা। কবিতার ভালোমন্দ বিচার করার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন সেটা 'মহুয়া'র বেলায় এখনও যথেষ্ট হয়নি।

ঠিক সেই কারণেই, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা করার দিন বোধ হয় এখনও আসেনি। যে পৃথিবীকে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অতি নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলেন সেই পৃথিবী ছেড়ে তিনি মাত্র সেদিন চলে গেছেন। শোকে বাংলাদেশ মুহ্যমান। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য-সমালোচনার জন্য যে পরিমাণ সময়ের ব্যবধান প্রয়োজন তা আমরা এখনও পাইনি।

১৯৩৯ সালে গুরুদেবের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় শান্তিনিকেতনে।

তাকিয়ে বললেন, লোকটি যে বড় চেনা-চেনা ঠেকছে। তুই নাকি বরোদার মহারাজা হয়ে গেছিস ?

আমি আপত্তি জানালুম না। তর্কে তাঁর কাছে বহুবার নাজেহাল হয়েছি। আপত্তি জানালে তিনি প্রমাণ করে ছাড়তেন, আমিই বরোদার মহারাজা, নয়তো কিছু একটা জাঁদরেল গোছের।

নিজেই বললেন, না না। মহারাজা নয়, দেওয়ান-টেওয়ান কিছু একটা।

আমি তখনও চুপ। 'মহারাজা' দিয়ে যখন আরম্ভ করেছেন, কোথায় থামবেন তিনিই জানেন।

তারপর বললেন, কি রকম আছিস ? খাওয়া-দাওয়া ?

আমি বললুম, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

আরে না না, আজকালকার দিনে খাওয়া-দাওয়া যোগাড় করা সহজ কর্ম নয়। তোকে আমি একটা উপদেশ দি'। ওই যে দেখতে পাচ্ছিস 'টাটা ভবন' তাতে একটি লোক আছে, তার নাম পঞ্চা ; লোকটি রাঁধে ভাল। তার সঙ্গে তুই যদি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারিস তবে এখানে তোর আহারের দুর্ভাবনা থাকবে না।

আমি তাঁকে আমার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে অনুরোধ জানালাম।

তখন বললেন, তুই এখনও বরোদা কলেজে ধর্মশাস্ত্র পড়াস না ?

আমি জানতুম, তিনি ঠিক জানেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রেরা কে কি করে। তাই মহারাজা বা দেওয়ান আখ্যায় আপত্তি জানাইনি।

তারপর বললেন, জানিস, তোদের যখন রাজা মহারাজারা ডেকে নিয়ে সম্মান দেখায় তখন আমার মনে কি গর্ব হয়, আমার কী আনন্দ হয়। আমার ছেলেরা দেশে-বিদেশে কৃতী হয়েছে।

তারপর খানিকক্ষণ আপন মনে কি ভেবে বললেন, কিন্তু জানিস, আমার মনে দুঃখও হয়। তোদের আমি গড়ে তুলেছি, এখন আমার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য তোদের প্রয়োজন। গোখলে, শুক্ল, তোরা সব এখানে থেকে আমাকে সাহায্য করবি। কিন্তু তোদের আনবার সামর্থ্য আমার কোথায় ?

তা যাক্। বলতে পারিস সেই মহাপুরুষ কবে আসছেন কাঁচি হাতে করে ?

আমি অবাক। মহাপুরুষ তো আসেন ভগবানের বাণী নিয়ে, অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে। কাঁচি হাতে করে ?

হাঁ, হাঁ কাঁচি নিয়ে। সেই কাঁচি নিয়ে সামনের দাড়ি ছেঁটে দেবেন, পেছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুরমার করে একাকার করে দেবেন। হিন্দু-মুসলমান আর কতদিন এরকম আলাদা হয়ে থাকবে।

তারপর আধঘণ্টা ধরে অনেক কিছু বললেন হিন্দু-মুসলমানের কলহ্ নিয়ে। তাঁকে যে এই কলহ কত বেদনা দিত সে আমি জানি। আমাকে যে বলতেন তার কারণ বোধ হয় আমি তাঁর মুসলমান ছাত্র। বোধ হয় মনে করতেন আমি তাঁকে ঠিক বুঝতে পারব।

গুরুদেব তখন বেশী কথা বললে হাঁপিয়ে উঠতেন। আমি তাই তাঁর কথা বন্ধ করার সুযোগ খুঁজছিলুম। তিনিই হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, আমার জামার পকেটে ছোট্ট ক্যামেরা। বললেন, ছবি তোলার মৎলব নিয়ে এসেছিস বুঝি। তোল, তোল। ওরে সুধাকান্ত, পর্দাগুলো সরিয়ে দে তো। কি রকম বসব বল্।

আমি বললুম, আপনি ব্যস্ত হবেন না ; আমি ঠিক তুলে নেব।

তোর বোধ হয় খুব দামী ক্যামেরা, জার্মানী থেকে নিয়ে এসেছিস, সব কায়দায় ছবি তোলা যায়। অন্যেরা বড় জ্বালাতন করে ; এরকম করে বসুন, ওরকম করে বসুন। কত কী !

ছবি তোলা শেষ হলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বললেন, কি রে, কিছু বলবি নাকি ?

আমি বললুম, একটা কথা বলতে চাই যদি কিছু মনে না করেন।

তিনি ক্লাসে যে-রকম উৎসাহ দিতেন ঠিক সেই রকম ভাবে বললেন, বল, বল, ভয় কি ?

আমি বললুম, এই যে আপনি বললেন, আপনার সামর্থ্য নেই আমাদের এখানে নিয়ে আসবার, সেই সম্পর্কে আমি শুধু আমার নিজের তরফ থেকে বলছি যে, বিশ্বভারতীর সেবার জন্য যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তবে ডাকলেই আসব। যা দেবেন হাত পেতে নেব।

গুরুদেব বললেন, সে কি আমি জানিনে রে, ভালো করেই জানি। তাই তো তোদের কাছে আমার সামর্থ্যহীনতার কথা স্বীকার করতে সঙ্কোচ হয় না।

মনে হল গুরুদেব খুশী হয়েছেন।

গুরুদেব আজ নেই।

কিন্তু সেই হারানো দিনের স্মৃতি আজো আমার মনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

# রবির বিশ্বরূপ

রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করার শক্তি আমাদের নেই। গীতাতে উক্ত তিন মার্গেই একসঙ্গে একই মানুষ চলেছে এর উদাহরণ বিরল। তিনি জ্ঞানী ছিলেন; শব্দতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তিনি কর্মী ছিলেন; গ্রামোন্নয়ন, কৃষির ঔৎকর্ষ্য, সমবায় সমিতি, শ্রীনিকেতন বিদ্যালয় তিনি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি রসের সাধক ছিলেন—এটাকে ভক্তিমার্গ বলা যেতে পারে—তিনি তাঁর ভগবানকে প্রধানতঃ রসস্বরূপেই আরাধনা করেছিলেন এবং ইহজগতের প্রিয়া, প্রকৃতিকে সেই রসস্বরূপেই কাব্যে, নাট্যে, গানে প্রকাশ করেছেন।

অথচ কোনো স্থলেই তিনি খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন নন। অর্থাৎ প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শব্দ সঞ্চয় করে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখছেন তখন তাঁর ভাষা কঠিন শব্দতাত্ত্বিকের নয়, তাঁর ভাষা সরস কবির মত। এবং সেখানে তিনি কর্মযোগীর ন্যায় এ উপদেশও দিচ্ছেন, কি করে সে ভাষাতত্ত্বের পুস্তক কাজে লাগাতে হয়। পক্ষান্তরে তিনি যখন বর্ষা, বসন্তের গান লিখছেন তখন উদ্ভিদবিদ্যায় অজ্ঞ সাধারণ কবির মত একই ঋতুতে কদম্ব আম্রমঞ্জরী ফোটান না। বস্তুতঃ আমাদের দেশে যে শত শত দিশী বিদেশী ফুল ফোটে, কোন্ জায়গায় কি সার দিলে ভালো করে ফোটে, এসব খবরও রাখতেন। বিদেশী ফুলের নামকরণ করতেন, একাধিক নাম-না-জানা দিশী ফুলেরও নামকরণ করেছেন। কথিত আছে—শহরাগত এক নবীন শিক্ষক অত্যন্ত সাধারণ জাম না গাব গাছ চিনতে পারেননি বলে কবি তাঁর হাতে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের সঁপে দিতে নারাজ হয়েছিলেন। আবার হাল চালানো, গাছ পোঁতার মত নীরস গদ্যময় ব্যাপার কি হতে পারে?—শ্রীনিকেতনে যাঁরই হলকর্ষণ বৃক্ষ-রোপণ উৎসব দেখেছেন তাঁরাই জানেন কবি কি ভাবে ঐ দুই সাধারণ কর্মকে সৌন্দর্যের পর্যায়ে তুলে নিয়েছেন। অনেকেরই বিশ্বাস—

"এস এস হে তৃষ্ণার জল"

বর্ষার গান। অন্তত সেই ঋতুতেই গাওয়া হয়। তা হলে প্রশ্ন উঠবে 'ভেদ করি[১] কঠিনের ক্রূর বক্ষতল' 'গূঢ় অন্ধকার হতে' কে আসছে? 'মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃঙ্খলে'—কে সে?

(১) আমরা 'করিই' শুনেছি। গীতবিতানে দেখছি 'করো' আছে। অর্থের অবশ্য কোনো পার্থক্য হয় না।

আসলে এটি রচিত হয় শান্তিনিকেতনে প্রথম টিউব-উয়েল খননের সময়। মাটির নিচে যে জল বন্দী হয়ে আছে তাকে বেরিয়ে আসবার জন্য কবি কর্মযোগের প্রতীক কলকব্জার বন্দনা-গীতি ধরেছেন।

সব সময়েই তিনটি জিনিস যে একই আধারে থাকবে এমন কোনো ধরা-বাঁধা নেই কিন্তু মোটামুটি বলা যেতে পারে, তিনি দুই, আড়াই, কিংবা তিন ডাইমেনশনেই চলুন, আমরা চলতে জানি শুধু এক ডাইমেনশনে এবং তাই তাঁর সমগ্র রূপ আমাদের পক্ষে ধরা কঠিন, প্রায় অসম্ভব। (তিরোধানের পূর্বে তিনি এক চতুর্থ ডাইমেনশনে চলে যান এবং সেটি এমনই রহস্যাবৃত যে, উপস্থিত সেটি উল্লেখ করবো না; কারণ ঐটে ভালো করে বোঝবার জন্য আমি এখনো হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছি)।

সে অসম্ভব কি কখনো সম্ভব হবে, এবং যদি হয় তবে কি প্রকারে হবে?

এটা বোঝানো যায় শুধু তুলনা দিয়ে।

চিত্রকর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে গুণী রসিকেরা চেনেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি বাল্যবয়স থেকেই ক্ষীণ। তিনি চার হাত দূরের থেকেই কোন জিনিস ভালো করে দেখতে পেতেন না।

যৌবনে তিনি একখানি বিরাট দেয়াল-ছবি বা ফ্রেস্কো আঁকতে আরম্ভ করেন। বড় বড় চিত্রকররাও সম্পূর্ণ ফ্রেস্কোর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখার জন্য বার বার পিছনে হটে ছবিটাকে সমগ্ররূপে দেখে নেন। আমরা, দর্শকরাও ছবি শেষ হওয়ার পর যখন সেটি দেখি তখন দূরের থেকে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখি—তখন খুঁটিনাটি, সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখতে পাইনে—পরে কাছে গিয়ে খুঁটিনাটি দেখি—তখন আর তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখতে পাইনে।

পূর্বেই বলেছি, বিনোদবিহারী দূরের থেকে কিছুই দেখতে পান না। তাই তিনি অনুমানের উপর নির্ভর করে একদিকে ছবি আঁকা আরম্ভ করে অন্য প্রান্তে এসে শেষ করতেন, কিংবা খাবলা খাবলা করে যেখানে খুশী খানিকটে এঁকে নিতেন। পরে দেখা যেত পার্সপেক্‌টিভ না দেখতে পেয়েও বিনোদবিহারীর বিরাট ফ্রেস্কোর এ-কোণের হাতী ও-কোণের প্রজাপতির চেয়ে যতখানি বড় হওয়ার কথা ততখানি বড়ই হয়েছে। তিনি অবশ্য কখনো সেটা দেখতে পেতেন না, কারণ যতখানি দূরে এলে আমরা সমগ্র ছবি দেখতে পাই ততখানি দূরে এলে তিনি সব কিছু ধোঁয়াটে দেখতেন।

একদিন তাঁর এক শিষ্য একটি ক্যামেরা নিয়ে এসে উপস্থিত। যতখানি দূরে

দাঁড়ালে পুরো ক্যামেরায় ধরা পড়ে ততখানি দূরে দাঁড়িয়ে সে ক্যামেরায় ঘষা কাচের উপর প্রতিবিম্বিত পুরো ফ্রেস্কোটি সে বিনোদবিহারীকে দেখালে। এই তিনি তাঁর আঁকা পূর্ণাঙ্গ ছবি জীবনে প্রথম দেখতে পেলেন। একসঙ্গে এক কোণের হাতী ও অন্য কোণের প্রজাপতি দেখতে পেলেন, এক চিত্রাংশ অন্য চিত্রাংশের সঙ্গে ঠিক ঠিক যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন থাপ খেয়ে আঁকা হয়েছে কিনা দেখতে পেলেন। অবশ্য ঘষা কাচের উপর খুঁটিনাটি কারুকার্য দেখতে পাননি ; কিন্তু সে জিনিসে তাঁর প্রয়োজন ছিল না ; কারণ কাছে দাঁড়িয়ে তো তিনি সেগুলো ভাল করেই দেখতে পান।

এই ক্ষুদ্র রচনায় আমি এত দীর্ঘ একটি উপমা দিলুম কেন ? কারণ বহু বৎসর ধরে ভেবে ভেবেও আমি এযাবৎ খুঁজে পাইনি কি করে আরো সংক্ষেপে আমার বক্তব্যটা বোঝাতে পারি।

পূর্বেই বলেছি, সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হলে আমাদের যতখানি দূরে যেতে হয় ততখানি দূরে গেলে আমাদের সব কিছু ধোঁয়া লাগে। ঘষা কাচ হলে আমরা তাঁর পূর্ণ রূপ দেখতে পেতুম।

তা হলে এই ঘষা কাচ জিনিসটে কি ?

কোনো মহৎ কবির পরবর্তীকালে যখন সবাই তার বিরাট সমগ্র রূপ দেখার চেষ্টা করে নিষ্ফল হচ্ছে তখন হঠাৎ আবির্ভূত হন আরেক মহৎ ব্যক্তি—যিনি কবির সর্বাঙ্গসুন্দর সমগ্র ছবি ঘষা কাচের মত তাঁর বুকে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর রচনায়, তাঁর কাব্যে তিনি তখন কবিকে এমনভাবে এঁকে দেন যে আমরা অক্লেশে তাঁর পূর্ণ ছবিটি দেখতে পাই। শক্তিমান জন দ্বারা কোনো দুরূহ কার্য সমাধিত হওয়ার পর সাধারণের পক্ষে তা অতি সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কালিদাস বলেছেন,

'মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ'

'কঠিন মণিকে হীরক দ্বারা বিদ্ধ করিলে যেমন সেই ছিদ্র দিয়া অনায়াসে ঐ মণির মধ্যে সূত্রের প্রবেশ সম্ভব।'

কালিদাস সুবাদেই বলি, এই এ-যুগের আমাদের রবীন্দ্রনাথই তাঁর যে সর্বাঙ্গসুন্দর ছবি এঁকেছেন, ভারতীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর যে বিরাট কলেবর আমাদের দেখিয়েছেন, সে তো অন্য কেউ ইতিপূর্বে করে উঠতে পারেননি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ যোগাযোগ বিরল নয়। এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান

জর্মন সাহিত্য। গ্যোটের পঞ্চমুখে পঞ্চতন্ত্র কথা একই সঙ্গে শোনবার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য জর্মনিকে বহুকাল অপেক্ষা করতে হয়নি। তাদের সৌভাগ্য, অংশত গ্যোটেরও সৌভাগ্য যে, তাঁরই জীবদ্দশায় হাইনের মত কবি জন্মগ্রহণ করেন। দুজনাতে কয়েক মিনিটের তরে দেখাও হয়েছিল—মাত্র একবার। সে অভিজ্ঞতা কারোরই পক্ষে সুখদা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী যুগে হাইনে যখন ঘষা কাচের মত তাঁর বুকের উপর গ্যোটের পূর্ণ ছবি প্রতিবিম্বিত করলেন তখন জর্মন মাত্রই গ্যোটের বিরাট ব্যক্তিত্ব অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো।

রবীন্দ্রনাথকে সে-ভাবে দেখাবার মত মনীষী এখনো এ জগতে আসেননি।

প্রার্থনা করি, আমাদের জীবদ্দশায়ই তিনি আসেন। বড় বাসনা ছিল, মৃত্যুর পূর্ব তাঁর বিশ্বরূপটি দেখে যাই॥

## ইয়োরোপ ও রবীন্দ্রনাথ

ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর সঙ্গে যাঁরাই অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, ইয়োরোপবাসী রবীন্দ্রনাথকে চেনে কত অল্পই। অথচ আমরা সকলেই জানি যে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি যখন প্রথম বিলাতে প্রকাশিত হয় তখন তিনি সে দেশে কী অদ্ভুত সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তার কয়েক বৎসর পর যখন কবি কন্টিনেণ্ট ভ্রমণ করেন তখন তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য কী অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে কত লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হয়েছে। এবং সর্বশেষ কথা এ জানি যে, ক্রমে ইয়োরোপে তাঁর খ্যাতি ম্লান হতে থাকে, এমন কি একাধিক সুপরিচিত সমালোচককে এ-কথাও বলতে শোনা গিয়েছে, তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল কোন্ স্থূল বুদ্ধিতে এবং যাঁরা টমসনের রবীন্দ্রজীবনী মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরাও হতাশ হলেন এই দেখে যে তিনি পর্যন্ত কবির কাব্যরসে আদৌ নিমজ্জিত হতে পারেননি, অথচ তিনি যে খানিকটা বাঙলা ভাষা জানতেন সে-কথাও সত্য। এ বইখানা রবীন্দ্রনাথকেও কিঞ্চিৎ বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং বোধ হয় তার প্রধান কারণ তিনিও হতাশ হলেন এই ভেবে যে, টমসনই যখন তাঁর কাব্যরস আস্বাদন করতে পারলেন না তখন ইয়োরোপের সাধারণ পাঠক করবে কি প্রকারে?

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি নিয়ে যখন ইংরেজ কবিগণ মত্ত তখন এ-দেশে আমরা আশ্চর্য হয়েছি যে এর ভিতর ইংরেজ কি পাচ্ছে যে তার এত উচ্ছ্বসিত

প্রশংসা করছে। গীতাঞ্জলির গান বাঙলায় গাওয়া হয়—ইংরেজিতে তা নেই—বাঙলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে এ গানগুলি—ইংরিজিতে যেন চুম্বক, এবং বাঙলা কবিতারূপে এ গানগুলির যে গীতিরস পাই ( সুর বাদ দিয়েও ) ইংরেজিতে তা কই! মনকে তখন এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি যে হয়তো ইংরেজ পাঠক ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে তার মাতৃভাষায় এমন এক ইংরেজি গীতিরস পায় যেটা আমাদের অনভ্যস্ত কান ধরতে পারে না।

হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবস রাত্রি
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণপারে।

এটিকে কবিতারূপে পড়ে আমরা যে গীতিরস পাই,

Like a flock of homesick cranes flying night & day back to their mountain nests, let all my life take, its voyage to its eternal home in one salutation to Thee :

পড়ে তো সে-রস পাইনে। তখন মনকে বুঝিয়েছি যে হয়তো এই ইংরেজি অনুবাদে শব্দগুলি এমনভাবে চয়ন ও সাজানো হয়েছে যে ইংরেজ তার ভিতর আপন গীতিরস পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে।

গীতাঞ্জলির ফরাসী জর্মন এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ ইংরেজি অনুবাদ থেকে। সে সব অনুবাদে মূলের রস আরো পরিশুষ্ক হওয়ার কথা।

রসের দিকের কিছুটা বাদ দিয়ে যখন ভাবের দিকটা দেখি তখন বরঞ্চ খানিকটা বুঝতে পারি, ইংরেজি এবং অংশত ফরাসী জর্মন তথা অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার গীতাঞ্জলি কেন গুণীজনকে মুগ্ধ করেছিল।

প্রথমত রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি অনুবাদে ব্যবহার করেছেন কিঞ্চিৎ প্রাচীন ইংরেজি। সে ভাষা কিছুটা ইংরেজি বাইবেলের ভাষা। এ দেশের তুলনা নিলে বলবো, যে বাঙালী বৈষ্ণব ভক্ত বিদ্যাপতি পড়ে আনন্দ পান তিনি ভানু সিংহের পদাবলীর ভাষা পড়েই মুগ্ধ হবেন, তার গভীরে অতখানি প্রবেশ করবেন না—বিশেষতঃ সে যদি অবাঙালী হয় এবং বৈষ্ণব না হয়ে ম্লেচ্ছ-যবন হয়।

দ্বিতীয়তঃ গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রভু-সখা-প্রিয়কে যে রূপ দিয়েছেন তার সঙ্গে ইংরেজ কিছুটা পরিচিত। বাইবেলের 'সং অব সংস' ( সং অব সলোমোন ) এবং 'সাম্‌স' গীতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা মিলটি অনায়াসেই দেখতে পাবেন। পার্থক্য শুধু এই যে 'সং অব সলোমনে' প্রেমের দৈহিক দিকটা

অনেকখানি প্রাধান্য পেয়েছে—গীতাঞ্জলিতে তা নয়—এবং সাম্‌স্‌ গীতিতে ভগবানের প্রিয় স্বরূপ কম, তিনি সেখানে দয়াল প্রভু, তিনি সর্বশক্তিমান কর্তা, তিনি ইচ্ছে করলে এ দাসকে তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিতও করতে পারেন। এর সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে সান্‌ খোয়ান দে লা ক্রুসের ভগবদ প্রেমের কাব্য। এর মিল 'সং অব সংসের' সঙ্গে—কিঞ্চিৎ কায়িক প্রেম। যে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথকে ইয়োরোপের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত করে দিয়েছিলেন তিনি সান্‌ খোয়ানের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর রচনাতে এঁর প্রচুর উদ্ধৃতি আছে। কিছুটা এই কারণেও ইয়েটস এবং তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা সহজ হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ গীতাঞ্জলির প্রভু-সখা-প্রিয়া কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মের ভগবান নহেন। ইংলণ্ডে এরকম অনেক ভাবুক আছেন যাঁরা খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন, এবং তাই সম্প্রদায়মুক্ত চিত্তে ঈশ্বরের কাছে আসতে চান। ওদিকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু (এখানে ব্রাহ্ম হিন্দুর পার্থক্যের কথা উঠছে না—বিদেশীর কাছে এ-দেশের ব্রাহ্মণ মাত্রই যে হিন্দু সে তারা ধরে নেয়) হয়েও যে ব্রহ্মকে তাঁদের সামনে কাব্যে রসস্বরূপ প্রকাশ তা দেখে তাঁদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। এইসব সংস্কারমুক্ত ইংরেজ দূর বিদেশীর আরাধনার ধন আপন সাধনার ধনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে—দুইই এক ভগবান। তারা আশ্বস্ত হল, তারা একা নয়। খৃষ্টধর্মে আস্থা হারিয়েও তারা দেখে ধর্ম তাদের ছাড়েনি।

অনেকটা এই সব কারণেই 'ডাকঘর' তাই জনপ্রিয় হয়েছিল।

তাই আমার মনে হয়, ইংরেজ রবীন্দ্রনাথের ভাবের দিকটাই দেখেছিল বেশী, তাঁর রস-সৃষ্টি তারা করতে পারেনি। আমরা বাঙালী কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে চিনি প্রধানতঃ রসস্রষ্টারূপে; তাই তাঁর বর্ষাবসন্তের গীতি তার বিরহ-বেদনার প্রতি প্রীতি আমাদের বেশী। রবীন্দ্রনাথ যতই অভিমান করে থাকুন না কেন, আমরা তাঁকে চিনেছি অন্য যে কোনো জাত অপেক্ষা বেশী।

তা সে যাই হোক, মূল কথায় ফিরে গিয়ে বলি, ভাবের পরিবর্তন হয় রসের পরিবর্তনের চেয়ে বেশী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিজেতা ইংলণ্ডেই ভগবানে বিশ্বাস একসঙ্গে অনেকখানি কমে যায়। বরঞ্চ পরাজিত জর্মনি আর কিছু না পেয়ে ভগবানকে আঁকড়ে ধরলো। ইংলণ্ডে তাঁর জনপ্রিয়তা কমলো; জর্মনিতে বাড়লো। তার কয়েক বৎসরের মধ্যেই জর্মনি যখন আপন পায়ে খানিকটে দাঁড়ালো সেখানেও তাঁর জনপ্রিয়তা কমলো—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেটা লক্ষ্য করে উল্লেখ করেছেন।

এর সঙ্গে একটা অত্যন্ত স্থূল কথা বলে রাখি। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ভাবের দিক দিয়ে হয়তো বা ইয়োরোপের দু'একজন গুণীজ্ঞানী গীতাঞ্জলির ব্রহ্মকে চিনতে পারবেন, কিন্তু ঐ মহাদেশের সাধারণজন হয় তাঁকে অবহেলা করে নয় চার্চের ভগবানকে নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। আপন চেষ্টায় রসস্বরূপ পরমেশ্বরকে পাবার চেষ্টা তাদের নেই বললেও চলে। কিছুটা আছে ক্যাথলিক মিস্টিক ফাদারদের ভিতর—কিন্তু তাঁরাও আপন ধর্মের দিগদর্শক নিয়েই সন্তুষ্ট। কাজেই এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ইয়োরোপে কখনো জনপ্রিয় হবেন তা আমার মনে হয় না।

তাই যখন তাঁর খ্যাতি ইয়োরোপে কমলো, আমরা আশ্চর্য হইনি।

আজ যে রবীন্দ্রনাথের স্মরণে বিশ্ববাসী তাঁকে সম্মান জানাচ্ছে, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করছে তাতে আমরা খুশী। কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করলে জানবো, আজ পৃথিবীর সব দেশই আমাদের প্রিয় হতে চায়—তার অন্যতম কারণদ্বয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। এ উচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয়ের উৎস থেকে উদ্বেলিত হয়নি। তাই বর্ষ শেষে আবার যদি দেখি—১৯১৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যা দেখেছিলুম—সে জোয়ার কোনো চিহ্নই রেখে যায়নি তাতে যেন বিস্মিত বা মর্মাহত না হই।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার অত্যন্ত সুদৃঢ় বিশ্বাস ইয়োরোপ একদিন রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয় পাবে। সেটা সম্ভব হবে যেদিন ইংরেজ ফরাসী জর্মনের বেশ কিছু লোক বাঙলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্যাপকভাবে আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁর রসসৃষ্টির অনুবাদ করবে। তার কিছু কিছু লক্ষণ এদিক ওদিক দেখতে পাচ্ছি। একাধিক ক্যাথলিক ইতিমধ্যে অত্যুত্তম বাঙলা শিখে নিয়েছেন এবং একাধিক জর্মন এই নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক আরো অনেক বিদেশী বাঙলা শিখবে এবং অবশেষে রবীন্দ্রনাথের রচনা উপযুক্ত লোক দ্বারা অনূদিত হবে।

আমার ভয় শুধু একটি, এ-দেশে তথা বিদেশে ক্লাসিকসের সম্মান ক্রমেই কমে যাচ্ছে। মানুষ মনোরঞ্জক দিকটাই দেখছে বেশী; ক্লাসিকদের স্থায়ী গভীর সচ্চিদানন্দ রস তারা পরিশ্রম করে আস্বাদ করতে চায় না অথচ রবীন্দ্রনাথের মূল উৎস সেইখানেই।

সেই ভয় আমি কাটাই এই ভরসা করে যে রেনেসাঁসও তো হয়। বিরক্ত হয়ে আধুনিককে বর্জন করে মানুষ এ সংসারে কত না বার অপেক্ষাকৃত প্রাচীনের সন্ধানে বেরিয়ে নিত্য নবীনের সন্ধান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিত্য নবীন।

## কবিগুরু গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিষ্ঠান নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন। এঁদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান এই সম্পর্কে একটি শর্ত আরোপ করেন যে, কোনো লেখক যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপলক্ষ করে কোনো রচনা না পাঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির মনে হয়তো শঙ্কা ছিল, রবীন্দ্রনাথের নাম করে এঁরা হয়তো নিজেদের আত্মজীবনী লিখে বসবেন। শঙ্কাটা কিছু অমূলক নয়।

কিন্তু এ-শর্তের ভিতর একটা গলদ রয়ে গেল। এই প্রথম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা উল্লেখ করা যাবে —দ্বিতীয় জন্ম-শতবার্ষিকীর সময় এত দীর্ঘায়ু কেউ থাকবেন বলে ভরসা হয় না। কাজেই এই শতবার্ষিকীতে কেউই যদি মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে চিনেছিলেন, সে কথা না লেখেন, তবে দ্বিতীয় শতবার্ষিকীতে যাঁরা আজকের দিনের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পড়ে মানুষ রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটি নির্মাণ করতে চাইবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিক্ষুব্ধ হবেন। অবশ্য এই নিয়ে যে অন্যত্র ভূরি ভূরি লেখা হয়নি তা নয়, কিন্তু শতবার্ষিকীর নৈমিত্তিক ধ্যান এক রকমের অন্য নিত্য-রচনা অন্য ধরনের।

* * *

কিন্তু এই মানুষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়, তারও বর্ণনা দেওয়া হওয়া কি সহজ? প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ আর পাঁচজন কবি কিংবা গায়কের মত আপন কবিতা বা গান রচনা করার পর চট করে ধূলার সংসারে ফিরে এসে রাম-শ্যাম-যদুর মত তাস পিটে, হুঁকো টেনে দিন কাটাতেন না। দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসার পরও তাঁর বেশভূষা, বাক্যালাপ, আচার-আচরণে, দুষ্টের দমনে এবং শিষ্টের পালনে (আশ্রমের ছাত্রদের কথা হচ্ছে) তিনি কবিই থেকে যেতেন। এমন কি, আশ্রমের নর্দমা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় কবিজনোচিত কোনো বাক্য বেমানানসই মনে হলে—এবং মনে রাখা উচিত সেই বেমানানসইটাও তাঁর কবিসুলভ হৃদয়ই ধরে নিত—সেটাকে তিনি অন্তত কিছুটা হাস্যরস দিয়ে উচ্চ পর্যায়ে তুলে নিয়ে আসতেন। কিংবা সামান্য একটু অন্য ধরনের একটি উদাহরণ নিন।

তাঁর ভৃত্য বনমালী তাঁর জন্য এক গেলাস শরবৎ এনে দেখে বাইরের কে বসে আছেন। বনমালী থেমে যাওয়াতে কবি বললেন, 'ওগো বনমালী দ্বিধা

কেন ?' কবি বলেছিলেন সাধারণ ধুলো-মাটির দৈনন্দিন ভাষাকে একটু মধুরতর করার জন্যে। অথচ এ-দুটি তাঁর নিজের মনেও এমনই চাঞ্চল্য তুললো যে, তিনি সেদিনই গান রচনা করলেন,

হে মাধবী, দ্বিধা কেন,
আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরেতে
মন কেন গেল ঠেকি ॥

এমন কি কমলালেবুর সওগাৎ পেয়ে, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে যে তাঁকে সেগুলো নিবেদন করেছিল, তার স্মরণে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছেন, সেগুলো অনেক পাঠকই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে না চিনেও স্মরণ করতে পারবেন।

এতেও কিন্তু তাঁর এদিকটার পরিচয় অতিশয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমরা তাঁকে প্রধানত চিনেছি গুরুরূপে। সে সম্বন্ধে সুধীরঞ্জন দাশ, প্রমথনাথ বিশী প্রাঞ্জল ভাষায় সবিস্তর লিখেছেন—আমারও সংক্ষেপে লেখার সুযোগ অন্যত্র হয়েছে। কিন্তু কেমন যেন মনে হয়, আমরা যেটুকু অসম্পূর্ণভাবে দেখেছি, সেটিও যেন সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারিনি।

এমন গুরু হয় না। পড়াবার সময় তিনি কখনো বাক্য অসম্পূর্ণ রাখতেন না —প্যারেনথেসিসে, অর্থাৎ এক বাক্যের ভিতর অন্য বাক্য এনে কখনো ছাত্রদের মনে দ্বিধার সৃষ্টিও করতেন না, এবং প্রত্যেকটি বক্তব্য তাঁর পরিপূর্ণ মধুরতম ভাষায় প্রকাশ করতেন। আমার মনে কণামাত্র দ্বিধা নেই যে, তাঁর ক্লাস-পড়ানো যদি কেউ শব্দে শব্দে লিখে রাখতে পারতো তবে সে রচনা তাঁর 'পঞ্চভূত' কিংবা অন্য যে-কোনো শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে একাসনে বসতে পারতো। এমন কি একথাও অনায়াসে বলা যায়, সে হত এক অদ্ভুত তৃতীয় ধরনের রচনা। এবং আশ্চর্য, তারই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের প্রশ্নও জিজ্ঞেস করেছেন, উত্তরগুলো শুদ্ধ করে দিয়েছেন, তার একটি-আধটি শব্দ বদলে কিংবা সামান্য এদিক-ওদিক সরিয়ে তাকে প্রায় সুষ্ঠু ভদ্র-গদ্যে পরিণত করেছেন।

ছাত্রের সব প্রশ্নের উত্তর কোনো গুরু দিতে পারেন কি না বলা কঠিন, কিন্তু এটুকু বলতে পারি, আমাদের সম্ভব-অসম্ভব সব প্রশ্নের কথা ভেবে নিয়ে প্রতিদিন তিনি অনেক মূল্যবান (মূল্যবান এই অর্থে বলছি যে, তিনি যদি ঐ সময়ে বিশ্বজনের জন্য গান কিংবা কবিতা রচনা করতেন, তবে তারা হয়ত বেশী উপকৃত

হত ) সময় ব্যয় করে 'পড়া তৈরী' করে আসতেন। শেলী-কীটসের বেলা তা না হয় হল, কিন্তু একথা কি সহজে বিশ্বাস করা যায়, তিনি তার আপন রচনা 'বলাকা' পড়াবার সময়ে পূর্বে দেখে নিয়ে রেখে তৈরী হয়ে আসতেন!

এই ক্লাসেরই বৃহত্তর রূপ আমাদের সাহিত্য-সভা।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিয়মানুরাগী ছিলেন। যদিও আমাদের সাহিত্য-সভা নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার, তবু তিনি যেভাবে সে-সভা চালাতেন, তার থেকে মনে হত—অন্তত আইনের দিক দিয়ে—যেন তিনি কোনো লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারের মিটিং পরিচালনা করছেন। কোথায় কখন সভা হবে, তার কর্মসূচী বা এজেণ্ডা নিয়মানুযায়ী হল কি না, প্রত্যেকটি জিনিস তিনি অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। একটি সামান্য উদাহরণ দিই।

সভাতে পাকাপাকিভাবে এজেণ্ডা অনুযায়ী গান, প্রতিবেদন-পাঠ ( মিনিটস্ অব দি লাস্ট মিটিং ), প্রতিবেদনে কোনো আপত্তি থাকলে সে সম্বন্ধে আলোচনা এবং সর্বসম্মতিক্রমে তার পরিবর্তন, প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি, সংগীত ইত্যাদির পর সাধারণের বক্তব্য ( জেনারেল ডিসকাশন ) শেষ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির বক্তব্য বলতেন। এবং বিষয় গুরুতর হলে তাকে এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিতেও শুনেছি।

একদা প্রতিবেদন পাঠের সময় সভার সব কিছু উল্লেখ করার পর আমি পড়ে যাচ্ছি। 'সর্বশেষে গুরুদেব সভাপতির বক্তব্যে বলেন—'

এখানে এসে আমি থামলুম। কারণ গুরুদেব তাঁর পূর্ববর্তী সভাতে প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এবং আমার প্রতিবেদনে তার সারাংশ লিখতে গিয়ে সাধারণ খাতার প্রায় আট পৃষ্ঠা লেগেছিল। আমার মনে সন্দেহ জাগলো, এই দীর্ঘ আট পৃষ্ঠার প্রতিবেদন শোনার মত ধৈর্য গুরুদেবের থাকবে কিনা। কারণ যে জিনিস তিনি অতি সুন্দর ভাষায় এক ঘণ্টা ধরে বলেছেন, তারই সারাংশ লিখেছে একটি আঠারো বছরের বালক তার কাঁচা, অসংলগ্ন ভাষায়। সেটা শোনা কবির পক্ষে স্বভাবতই পীড়াদায়ক হওয়ার কথা। আমি তাই পড়া বন্ধ করে গুরুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাভরা স্বরে শুধালুম, 'এই সারাংশটি আট পৃষ্ঠার। পড়বো কি? তিনি তাঁর চিবুকে হাত রেখে আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'পড়ো।' আমাকে পড়তে হলো। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। কিছুদিন পরে দ্বিতীয় সভাতেও তারই পুনরাবৃত্তি। এবারেও সেই দ্বিধা প্রকাশ করলুম। একই উত্তর, 'পড়ো'।

তখন বুঝলুম, তিনি সম্পূর্ণ না শুনে প্রতিবেদন-পুস্তকে তাঁর নাম সই করবেন না। সেটা নিয়মানুযায়ী—লীগেল নয়।

কিন্তু পাঠককে চিন্তা করতে অনুরোধ করি, আঠারো বছরের ছোকরার কাঁচা বাঙলায় লেখা তারই সর্বাঙ্গসুন্দর বক্তৃতার বিকলাঙ্গ প্রতিবেদন শোনার মত পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতাও তিনি এড়িয়ে যেতেন না। আমার শুধু মনে হত, এই অযথা কালক্ষয় না করে ঐ সময়টুকু বাঁচিয়ে তিনি তো কোনো মহৎ কাজ করতে পারতেন!

* * *

রবীন্দ্রনাথ আমাদের গুরু এবং তিনি কবি। তাই তিনি আমাদের কবিগুরু। তিনি অবশ্য তাবৎ বাঙালীর কাছেই 'কবিগুরু', কিন্তু সেটা অন্যার্থে অন্য সমাস। আমরা তাঁর কবি-রূপ দেখেছি অন্যভাবে।

তিনি দিনের পর দিন কবিতা, প্রবন্ধ, ছোট গল্প এবং বিশেষ করে গান রচনা করে যেতেন এবং প্রত্যেকটি শেষ হলেই আমাদের ডেকে শোনাতেন। এই ভিন্ন রূপটি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সচেতন ছিলেন।

কোনো কবিতা লেখা শেষ হলে তিনি সেটি শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে কপি করে পাঠাতেন। একবার একটি গান পাঠিয়ে সঙ্গের চিঠিতে লেখেন,—

'বলা বাহুল্য, বর্ষামঙ্গলের গানগুলি একটা-একটা করে রচনা করা হয়েছে। যারা বইয়ে পড়বে, যারা উৎসবের দিনে শুনবে, তারা সবগুলি একসঙ্গে পাবে। প্রত্যেক গান যে অবকাশের সময় আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তারা দেখবে। আমার বিবেচনায় এতে একটা বড় জিনিসের অভাব ঘটল। আকাশের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে হার গাঁথলে সেটা বিশ্ব-বেনের বাজারে দামী জিনিস হতেও পারে, কিন্তু রসিকেরা জানে যে, ফাঁকা আকাশটাকে তৌল করা যায় না বটে কিন্তু ওটা তারাটির চেয়েও কম দামী নয়। আমার মতে যেদিন একটি গান দেখা দিলে, সেইদিনই তাকে স্বতন্ত্র অভ্যর্থনা করে অনেকখানি নীরব সময়ের বুকে একটিমাত্র কৌস্তভমণির মতো ঝুলিয়ে দেখাই ভালো। তাকে পাওয়া যায় বেশী। বিক্রমাদিত্যের সভায় কবিতা পড়া হত, দিনে দিনে, ক্রমে ক্রমে—তখন ছাপাখানার দৈত্য কবিতার চারদিকের সময়াকাশকে কালি দিয়ে লেপে দেয়নি। কবিও প্রতিদিন স্বতন্ত্র পুরস্কার পেতেন—উপভোগটা হাইড্রলিক জাঁতায় সংক্ষিপ্ত পিণ্ডাকারে এক গ্রাসের পরিমাণে গলায় তলিয়ে যেত না।

লাইব্রেরিলোকে যেদিন কবিতার নির্বাসন হয়েছে, সেদিন কানে শোনার কবিতাকে চোখে-দেখার শিকল পরানো হল, কালের আদরের ধন পাব্লিশারের হাটের ভিড়ে হলো নাকাল। উপায় নেই—নানা কারণে এটা হয়ে পড়েছে জটলা পাকানোর যুগ—কবিতাকেও অভিসারে যেতে হয় পটলডাঙার কলেজপাড়ায় অগ্নিবাসে চড়ে। আজ বাদলার দিনে আমার মন নিঃশ্বাস ফেলে বলছে, "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে"—দুর্যোগে জন্মালুম ছাপার কালিদাস হয়ে—মাধবিকা, মালবিকারা কবিতা কিনে পড়ে—জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে না। ইতি—১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬" ( দেশ, ১৩৬৮, পৃ ৮৩৫ )।

আমরা তাঁকে পেয়েছি যেভাবে তিনি চেয়েছিলেন—তাঁরই ভাষায় বলি, 'আজকের দিনের মাধবিকা, মালবিকার মত নয়।

কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে গঙ্গাজলে যে গঙ্গাপুজো করলুম, তারপর নিজের আর কোন্ অর্ঘ্য এনে বিড়ম্বিত হই ?

## মোল্লা ফরেজ

অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের স্মরণ থাকিবার কথা আমানউল্লা আফগানিস্তানকে রাতারাতি ফ্রান্সভূমিতে পরিবর্তন করিতে গিয়া কি দুরবস্থায় রাজত্ব হারান। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি কাবুল হইতে পলায়ন করিলে পর দস্যু-দলপতি হবীবউল্লা, তখল্লুস বাচ্চা-ই-সকাও ( ভারতবর্ষে বাচ্চা-সক্কা নামে পরিচিত ) কাবুল ও উত্তর আফগানিস্তানের বাদশা হন।

বাচ্চা ডাকাত। কাজেই রাজা হইয়া কাবুলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার দুরভিসন্ধি তাঁহার ছিল না। শান্তি স্থাপন করা অর্থ লুটতরাজ বন্ধ করা, আর লুটতরাজ বন্ধ করিলে তাঁহার সৈন্যেরাই বা মানিবে কেন? তাহাদিগকে তো ঐ লোভেই দলবদ্ধ করিয়া আমানউল্লার সঙ্গে লড়ানো হইল। রাজকোষ হইতে অর্থ দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিবার কথাই উঠে না, কারণ আমানউল্লা তাহার অর্ধেক ফুঁকিয়া দিয়াছিলেন নানারকম বিবেকবুদ্ধিহীন, অর্থগৃধ্নু দলপতিদিগকে বাচ্চার সঙ্গে লড়িবার জন্য প্ররোচিত করিতে গিয়া। দলপতিরা টাকা লইয়াছিল অসঙ্কোচে ও ততোধিক অসঙ্কোচে ও তৎপরতার সঙ্গে টাকা লইয়া উধাও-ও তাহারা হইয়াছিল। কিছু দিয়া কিছু হাতে রাখিয়া, টালবাহানা দিয়া লড়ানোর হুঁশিয়ার ফেরেব্বাজী জানিতেন আমানউল্লার পিতা আমীর হবীবুল্লা ও তাঁহার

পিতামহ, পরমনমস্য আমীর আব্দুর রহমান।

'জলের মত অর্থব্যয়' আর কলিকাতা শহরে বলা চলে না কাজেই বলি ইনফ্লেশেনী অর্থব্যয় করিয়া যখন আমানউল্লা লড়াই ও অর্থ উভয়ই হারাইলেন তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। সূর্যোদয়ের পূর্বেই এক কালরাত্রিতে তিনি বাকি অর্ধেক অর্থ লইয়া কান্দাহার মামার বাড়ী পলায়ন করিলেন—বিপদকালে আমীর-ফকির সকলেই মামার বাড়ীর সন্ধান লয়।

কান্দাহার ইন্তিংার মেহমনদারী করিল বটে, কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ দিতে নারাজ এ তত্ত্বওটি বুঝাইয়া দিল। আমানউল্লা তখন দেশত্যাগ করিলেন।

এদিকে বাচ্চার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমস্তম্ভীয় মোল্লাদের জেল্লাই বাড়িল কিন্তু অর্থাগম সরগরম হইল না। বাচ্চার সৈন্যকেই যখন লুট করিয়া জান বাঁচাইতে হয়, তখন মোল্লার তত্ত্বতালাশ করিবে কোন্ ইয়ার—ডাকুর সর্দারের তো কথাই উঠে না। তবুও বাচ্চা কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য মোল্লাদের চেল্লাচেল্লিতে কান দিলেন—তাঁহাদিগকে নানারকম ছোটখাটো চাকরি দিলেন। কিন্তু যে-দেশে বিশেষ কায়দায় পাগড়ী পরিলেই মোল্লা হওয়া যায় সেখানে মোল্লার সংখ্যা সাকুল্যে বিল্লির চেয়ে বেশী। বাচ্চা নিরুপায় হইয়া ফালতুদিগকে 'মুহতসিব' কর্মে নিযুক্ত করিয়া কাবুল বাসিন্দাদিগের পশ্চাতে লেলাইয়া দিলেন।

মুহতসিব এক অদ্ভুত কর্মচারী। ইনি একরকম 'রিলিজিয়স পুলিসম্যান'। তাঁহার কর্ম হাতে চাবুক লইয়া রাস্তাঘাটে নিরীহ প্রাণীকে নানারকমে উদ্ব্যস্ত করা। 'আজানের পর তুমি এখানে ঘোরাঘুরি করিতেছ কেন, ঈদের নামাজে কয়বার সেজদা দিতে হয়, আসরের নামাজের পর নফল পড়া মুনাসিব কিনা, ইফতারের নিয়ম কি?' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইলে মুহতসিব নাগরিকের পৃষ্ঠদেশে নির্মম চাবুক লাগান, অথবা নাগরিক ঠিকঠিক ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া মুহতসিবের দক্ষিণহস্তে ক্ষিপ্রগতিতে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন নহে—পৃষ্ঠরক্ষা করে। মুহতসিব প্রতিষ্ঠানই খারাপ একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু অজ্ঞ মোল্লাকে বেতন না দিয়া নাগরিকের পশ্চাতে লাগাইয়া দিলে সে যে বহুদিন যাবৎ গৃহস্থের অন্ন ধ্বংস করিয়া কাননস্থ মহিষকে তাড়না করিবে না তাহাতে কি সন্দেহ? বিজ্ঞ এবং ধার্মিক মোল্লারা এই মতই পোষণ করিতেন।

১৯২৮-২৯-এর শীতকালে কাবুলের রাস্তায় একদিকে লুটতরাজ অন্যদিকে মুহতসিব।

আমাকে একদিন ঐ সময় বিশেষ কর্মোপলক্ষে বাহির হইতে হইয়াছিল। বিশেষ কি, অত্যন্ত বিশেষ কর্ম থাকিলেও তখন কেহ বাহির হইত না। কারণ যেখানে মরণ-বাঁচন সমস্যা সেখানে রাস্তায় নিশ্চয় প্রাণ দিতে বাহির হইবে কে? কিন্তু আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া দুইটি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম —বন্ধুবরকে রাখিয়া গিয়াছিলাম তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে সাহস দিতে ও নিজে ডাক্তারের সন্ধানে।

পথে মোল্লা আবুল ফয়েজের সঙ্গে দেখা। তিনি ছিলেন মকতব-ই-হবীবিয়ার ধর্মশাস্ত্র বা দীনিয়াতের অধ্যাপক—আমার সহকর্মী। মোল্লাজী ছিলেন পরস্পরবিরোধী আচার-বিশ্বাসের মানোয়ারী জাহাজ। দেওবন্দের টাইটল কোর্স পাস ভাষ্যকর দিগ্‌গজ মৌলানা—অথচ পরিতেন স্যুট, পাগড়ী না—কারাকুলি টুপি অথবা ফেল্ট হ্যাট, গোঁফ ছিল কিন্তু দাড়ি অতি নিয়মিত কামাইতেন! নামাজ কড়াগণ্ডায় আদায় করিতেন, রোজা ফাঁকি দিতেন না; কিন্তু অন্য কোনো ধর্মকর্ম বা ধর্মালোচনায় কখনো তাঁহাকে লিপ্ত হইতে দেখি নাই। অনুসন্ধিৎসু হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেন, কিন্তু কলেজের অন্যান্য মোল্লাদের সঙ্গে মসলা মসাইল লইয়া কখনও বাকবিতণ্ডা করিতেন না। আমানউল্লার পক্ষ লইয়া হামেশা লড়িতেন এবং আফগানিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষা করার একমাত্র উপায় যে ইংরেজ-রুশকে বাঁদরনাচ নাচাইয়া সে-বিষয়ে তাহার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রকাশ্যে সেই রায়ই জাহির করিতেন।

তাঁহাকে রাস্তায় পাইয়া যেন জান কলবে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া আমার সেই কলব ধুকুধুকু করিতে লাগিল। বাচ্চার ভয়ে তখন বিদেশী ছাড়া কেহই স্যুট পরিবার সাহস করিত না। প্যারিস-ফের্তা পয়লা নম্বরের কাবুলী সায়েবরা তখন কুড়িগজি শেলওয়ার ও বাইশ-গজী পাগড়ী পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। অথচ দেখি মোল্লা আবুল ফয়েজ সেই মারাত্মক চেকের কোটপাতলুন পরিয়া নির্বিকারচিত্তে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন ও আমার মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব নিজেই করিয়া নিজেই বহাল করিলেন। আমি তাঁহাকে ঐ উৎকট সঙ্কটের সময় কেন স্যুট পরিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে যাইব এমন সময় কোথা হইতে এক ভীষণ-দর্শন মুহতসিব ততোধিক রোমাঞ্চন প্রজনন চাবুক হস্তে লইয়া আমাদিগকে ক্যাক্ করিয়া ধরিল।

আমার দিকে তাকাইয়া মুহতসিবজী বলিলেন, "আপনি (শুমা) বিদেশী,

আপনার উপর আমার কোনো হক নাই। আপনি যাইতে পারেন।"

বান্ধব-ত্যাগ সঙ্কটের সময় অনুচিত। বিশেষতঃ সেই বান্ধব ত্যাগ করিয়া যখন বৈদ্যরাজের বাড়ীতে একা যাওয়া ততোধিক অনুচিত অর্থাৎ প্রাণহানির সম্ভাবনা। সবিনয়ে বলিলাম, "হুজুর যদি ইজাজত দেন তবে দোস্তের আখেরী হাল কি হয় দেখিয়া যাইবার ইরাদা।" মুহতসিব বিরক্তির সঙ্গে বাঞ্ছিত ইজাজত মঞ্জুর করিলেন।

এদিকে দেখি মোল্লা আবুল ফয়েজ ঊর্ধ্বমুখে, নির্বিকারচিত্তে কাবুল পর্বত-গাত্রে চিনার পত্রে সূর্যরশ্মির ক্রীড়াজনিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অভিনিবেশ সহযোগে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কোন্ বিপদে, কোন্ ভাবে, তাহার খেয়ালই নাই।

মুহতসিবের মুখ দিয়া তখন শিকার ভোজনের লালা পড়িতেছে। সুটপরা কাবুলী! বেদীন নিশ্চয়ই 'দীনের' 'দ'ও জানে না, ইহাকে দীনিয়াতের তর্ক-বিতর্কের দ'য়ে মজাইতে ডুবাইতে কতক্ষণ! তারপর বিলক্ষণ অর্থাগম।

হায় মুহতসিব, তোমার হাতে চাবুক থাকুক আর নাই থাকুক, জানিতে না কোন্ বাঘার খপ্পরে পড়িয়াছ!

হুঙ্কার দিয়া, শহর-আরা হইতে চিল-সকুন প্রকম্পিত করিয়া মুহতসিব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ তো দেখি (ফার্সীতে দুই রকম সম্বোধন আছে, 'শুমা' অর্থাৎ 'আপনি' বা 'তুমি', আর 'তু' অর্থাৎ তুই—অপরিচিত কাহাকেও 'তু' বলা অভদ্রতার চরম লক্ষণ) কোন্ ইঁদারায় ইঁদুর পড়িয়া মরিয়া গেলে, সেই ইঁদারা হইতে কয় ডোল পানি তুলিলে পর সেই পানি নামাজের জন্য পুনরায় পাক বা জাহিজ হইবে?"

প্রশ্নটি কিছু সৃষ্টিছাড়া নহে। কিন্তু সাধারণ নাগরিককে এহেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা দুষ্টবুদ্ধির কর্ম। মুহতসিবের কর্তব্য সাধারণ নাগরিককে নিত্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নামাজ রোজা সংক্রান্ত প্রশ্ন করা, যেগুলি না জানিলে ফর্জ কর্মগুলি আদায় করা যায় না। ইঁদারা কোন্ অবস্থায় পাক আর কোন্ অবস্থায় না-পাক এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন অলিম মৌলবী-মৌলানারা। কারণ কাহারো ইঁদারায় ইঁদুর পড়িলে ব্যাপারটা এমন কিছু জরুরী দীন-ঘাতি নয় যে, তাহার ফৈসালা না জানিলে তদ্দণ্ডেই কাফির হইয়া যাইবার সমূহ সম্ভাবনা। সাধারণ নাগরিককে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অর্থ আর কিছুই নহে, তাহাকে বিপদারণ্যে নিক্ষেপ করা ও তৎপরে গুলী করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করা।

দেখি মোল্লা আবুল ফয়েজ তখনো তাঁহার সঙহিট্ গুনগুন করিতেছেন,—

"শবি আগর আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম
জোয়ান শওম, জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম।" *

মুহতসিব এবারে দারুল আমান হইতে খাক-ই-জব্বার পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করিলেন, "শুনিতে পাস নাই?"

আবুল ফয়েজ বলিলেন, "বিলক্ষণ, কিন্তু মসালা এতই প্যাঁচিদা যে মুক্ত রাজ-বর্ত্মে তাহার সমূহ আলোচনা ও সমস্যা-নিরূপণ সহজে সম্ভব হইবে না। এই তো কাওয়াখানা, চলুন চা খাইতে খাইতে শাস্ত্রালোচনা ও অন্যান্য বিবেচনা করা যাইবে।"

'অন্যান্য বিবেচনার' কথা শুনিয়া মুহতসিবের দুষ্টমুখে মিষ্টহাসি খেলিয়া গেল—যেন কাবুলি বরফে সোনালি রোদ—বাঙলায় যাহাকে বলে 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি!'

কাওয়াখানায় ঢুকিয়া মোল্লা আবুল ফয়েজ ছোকরাকে দুইজনের জন্য চা আনিতে বলিলেন। আমি নিজের জন্য চা'র হুকুম দিতে গেলাম—মোল্লা ফয়েজ আমাকে থামাইয়া বলিলেন, "সে কি কথা, দুইজনের চা তো তোমার আমার জন্য। মুহতসিব সাহেবকে আমরা চা খাওয়াইব কি করিয়া, সে তো রিশওদ দেওয়া হইবে; তওবা, তওবা, সে বড় অপকর্ম, কবীরা গুণাহ, ওস্তাগফিরুল্লাহি রব্বি জম্বি মিন কুল্লি, ওতুবু ইলাইহি।"

বলিয়া মুহতসিবের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া এক গাল হাসিয়া লইলেন।

মুহতসিব রাগে সিদ্ধ-চিংড়ির রঙ ধারণ করিয়াছেন। তবে কাওয়াখানার পাবলিক অর্থাৎ আমাজুন্নাসের সম্মুখে হুংকার দিবার ঠিক হিম্মৎ না পাইয়া বলিলেন, "ফিতরতি রাখ্, সওয়ালের জবাব দে।"

মোল্লা ফয়েজ বলিলেন, খাস আরবীতে "ইস্তান্না সুগাইর", অর্থাৎ 'ধৈর্যংকুরু'; "মসালা খয়নী পেচিদা অর্থাৎ বড়ই প্যাঁচালো। ঝটপট উত্তর হয় না, প্রথম বিবেচনা করা উচিত—বায়দ দীদা শওদ—ইঁদুর কেন ইঁদারায় পড়িল? সেই সবব মজবুত পাকাপোখতা মওজুদ না হওয়া পর্যন্ত জবাব অত্যন্ত কঠিন, বসীয়ার দুশওয়ার!"

মুহতসিব চটিয়া বলিলেন, "কী বাজে বকিতেছ, ইঁদুর ইঁদারায় পড়িয়াছে সেই তো কাফী।"

---

* আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই
যৌবন পাব, গোড়া হতে তবে এ জীবন দোহরাই।

মোল্লা ফয়েজ বারতিনেক অর্ধচক্রাকারে দক্ষিণ হইতে বাম দিকে মস্তকান্দোলন করিয়া বলিলেন, "ওয়াহ ওস্তাদ! কারণ বিনা কার্যের অনুসন্ধান—বেগয়ের ওয়াজহ তফতীশ বিলকুল বেফায়দা। প্রথম মনঃসংযোগ করিয়া দেখিতে হইবে ইঁদুর কেন ইঁদারায় পড়িল। তাই তো বলিলাম, খসালা বসীয়ার পেচিদা। তবু আপনার তকদীর ভালো—আমার মত পাক্কা ফীকাহ জাননেওয়ালা পাইয়াছেন। শুনুন, আমার মনে হয়, ইঁদুরকে কোনো বিড়াল তাড়া করিয়াছিল, তাই সে প্রাণের ভয়ে ইঁদারার দিকে পলাইয়া যায় ও জলে ডুবিয়া মরে। নয় কি?"

এই বলিয়া মোল্লা ফয়েজ আমার দিকে এমন ভাবে তাকাইলেন যেন গভীর অতল সমুদ্র হইতে অতি উজ্জ্বল বহুমূল্য খনি উত্তোলন করিয়াছেন। সে-তাকানোতে আত্মশ্লাঘা যেন ঝিলমিল করিয়া উঠিল।

আমি হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে ঠিক আন্দাজ করিতে না পারিয়া অন্ধকারেই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, "বেশক, আলবৎ, জরুর।"

মোল্লা ফয়েজ পরম পরিতোষের দিলখুস হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন মুহতসিব সাহেব, দীনদুনিয়ার মামেলায় নাদান এই নওজোয়ানও সায় দিতেছে। আচ্ছা, আবার মোদ্দা কথায় ফিরিয়া যাই। যখন প্রমাণসবুত হইল যে প্রাণরক্ষার্থে মূষিক কূপতলস্থ হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে তখন সে তো শহীদ। কারণ, কোন্ উল্লু জানে না, জান বাঁচানা ফর্জ? ফর্জকাম করিতে গিয়া ইঁদুর শহীদ হইল। তাহার কবর হইবে বিনা দফন কাফনে। তাহাই হইল। শহীদের লাশ পানি নাপাক করিবে কেন? পানি দুরুস্ত।"

মুহতসিব দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা?"

মোল্লা ফয়েজ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "ইস্তান্না, ইস্তন্না সুগহির, সবুর, সবুর। মসলা মসাঈলের মামেলা, ধীরেসুস্থে কদম ফেলিতে হয়। ইঁদুর মরিবার আরও তো কারণ থাকিতে পারে, সবব কি আর নাই?

এও তো হইতে পারে যে, ইঁদুর জান বাঁচানার ফর্জকামে মসগুল ছিল না। সে ইঁদারার কিনারায় খেল-কূদ করিতেছিল, হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া জান কব্জ হইল। তাহা হইলে তো সে আলবত্তা শহীদ নহে। তবেই সওয়াল—আর সে সওয়াল আরও পেচিদা—ইঁদুরের দরজা কি? আমি বহুত তফতীশ করিয়া দেখিলাম, ইঁদুর যে খেল-কূদ করিতেছিল সে সম্পর্কে হদীস আছে। নও-মুসলিম ও আনসাররা মদীনা শরীফে বহুত খেল-কূদ করিতেন কাফেরের সঙ্গে লড়িবার জন্য। লেহাজা কাজে কাজেই আনসাররা যাহা কর্তব্যকর্ম বিবেচনা

করিয়া করিতেন তাহা নবীর উপদেশ মতই। অতএব ফর্জ কাজের ফায়দা না পাইলেও সে কর্ম সুন্নতুন্নবী, অর্থাৎ নব'র আদেশে-কৃত অতিশয় অনুমোদিত পুণ্য কাজ। তাহার লাশেও তো পানি না-পাক হইতে পারে না। কি বলো, আগা জান ?" শুধাইয়া মোল্লা ফয়েজ আরেক দস্ত হাসিয়া লইলেন।

মুহতসিব বেশ কড়া সুরে বলিলেন, "দেখ, ওসব ঠাট্টা মশকরার কথা নয়—"

"সবুর সবুর", মোল্লা ফয়েজ বলিলেন "সবুর করুন সরকার। বুঝিলাম, আপনার রসকস বিলকুল নাই। তবে মরুন গিয়া আপনার দশ ডোল না বারো ডোল পানি তুলিয়া,—পাড়ার যে কোন মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বাতলাইয়া দিবে। ভাবিয়াছিলাম, গুণীজনের সহবতে আসিয়াছেন, জখমী মসলা মসাইল দুরুস্ত করিয়া লইবেন, সে মতলব যখন নাই তখন আমি বে-চারা না-চার। চলো হে আগাজান, তুমি না হেকিমের বাড়ী যাইবে !"

বাহির হইবার সময় শুনিলাম, কাওয়াখানায় অট্টহাস্যের রোল উঠিয়াছে।

## বড়লাটি লাঠি

বড়লাট ভারতবর্ষের নেতাদের ডাকিয়া তাঁহাদের হাতে লাঠি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; যাহাতে তাঁহারা গাঁটের খাইয়া মনের আনন্দে বনের মহিষ তাড়াইতে পারেন। নেতারা সে লাঠিটা আত্মসাৎ করিবার লোভে একে অন্যের বাড়ীতে বিস্তর হাঁটাহাঁটি বিস্তর লাঠালাঠি করিয়া দেখিলেন ভাগবখরার প্রচুর বখেড়া। কেহ চায় সে লাঠির পাঁচ বিঘৎ, কেহ চায় তিন বিঘৎ, কেহ বলে লাঠিটা উদয়াস্ত বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিবে, কেহ বলে, না, যখন বড়লাটি লাঠি তখন লাট সাহেব ইচ্ছা করিলেই বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। ইত্যাকার বাক্য বিনিময় মনো-মালিন্যের পর যখন কিছুতেই কোনও প্রকার চরম নিষ্পত্তি হইল না, তখন লাট সাহেব প্রকাশ্যে অশ্রুবর্ষণ করিয়াও গোপনে সানন্দে মৌলা আলীতে মানত পূর্ণ করিয়া লাঠিখানা মাচাঙে তুলিয়া রাখিলেন। লাঠিখানি তিলোত্তমার কার্য উত্তমরূপে সমাধান করিয়াছে। ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় আবার সুন্দ উপসুন্দ ভাই-ব্রাদার হইয়া কৌসিল রণাঙ্গণে দেবতাদের পর্যুদস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহা হইল শুষ্ক যষ্টিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

বড়ভাই বলিতেছেন, ছোটভাই বড়ই অর্বাচীন ; ছোট ভাই বলিতেছেন, 'ভাই

ভাই কোরো না বলছি। তুমি আমার ভাই নাকি, তুমি আমার জানি দুশমন।' তিলক-কাটা গোঁড়া ভাইকে ডাকা হয় নাই বলিয়া তিনি খণ্ডিত বিপ্রলব্ধের ন্যায় রোদন করিতেছিলেন (এমন কি এই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যাইবেন বলিয়া মস্কোর ফলার উপেক্ষা করিয়া অনুশোচনা করিতেছিলেন), লাঠির ভাগাভাগি হইল না দেখিয়া পরমানন্দে বগল বাজাইতেছেন।'

আমরা দুঃখিত হই নাই, আনন্দিতও হই নাই। এ যষ্টি যে আমাদের তমসাবৃত দেশকে জ্যোতিতে লইয়া যাইবে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইবে এমন আশা আমরা কখনও করি নাই। যুদ্ধের পর বেকারী, অর্থাভাব, পল্টনফের্তা সৈন্যের কৃষিক্ষেত্রাভাব ইত্যাদি যে গন্ধমাদন জগদ্দলন হইয়া আমাদের দেশে বুকের উপর চাপিবে, তাহা ঐ যষ্টি-লিভার দ্বারা উত্তোলন করা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত যষ্টি লোভ না করার আরও বাহান্নটা কারণ আছে তাহার নির্ঘণ্ট অথবা ফিরিস্তি উপস্থিত নিষ্প্রয়োজন। শুধু বাহান্ন নম্বরের কারণটা নিবেদন করি; যাহারা মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করিতে পারে, তাহাদের সে-রাজদণ্ড হর্ষের ন্যায় সন্তোষক্ষেত্রে দান করিবার ক্ষমতা নাই।

অপিচ অকপট চিত্তে স্বীকার করি যে, বিপক্ষে বাহান্নটা কারণ থাকা সত্ত্বেও যষ্টিতে লোভ করিবার স্বপক্ষে একটি প্রকৃষ্ট যুক্তি ছিল। সে যুক্তি নিবেদন করিতে আমাদের অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হয়, কারণ যাঁহাদের জন্য আমাদের এই লোভ তাঁহারা হয়ত এই বৃত্তিকে ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ভাবিয়া আমাদিগকে ধিক্কার দিবেন।

আমরা রাজবন্দীদের কথা ভাবিতেছি। '৪২ আন্দোলনের দেশসেবক, তৎপূর্ববর্তী তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী, স্টালিন-বিরোধী গণতন্ত্রী, জমিয়ত 'উল-উলমার কর্মিগণের কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয় যে, ইঁহাদের দুঃখের অবসান যদি হিমালয়ের কলির শৈলেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াই হয়, তবে তাহাই হউক। আত্মজন বন্ধুজন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হইতে বৎসরের পর বৎসর বিরহ, দিনে দিনে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার তুষানল দাহন, যৌবনের সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তির নিষ্পেষণ, কারাগারে পাষাণপ্রাচীরের অন্তরালে বিপাকের বিভীষিকাময় রজনী যাপন, আশাহীন উদ্যমহীন নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ত ঘূর্ণ্যমান তাঁহাদের অদৃষ্ট চক্রনেমিতে এইগুলিই তো তীক্ষ্ণ লৌহকীলক। স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল হইয়া তাঁহাদের বিজয়মাল্যে বিভূষিত করিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইবার আশা যখন দিন দিন মরীচিকার মত চক্রবাল হইতে চক্রবালান্তরে বিলীন হইয়া যাইতেছে তখন আর অত শাস্ত্র

মিলাইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিয়া কী-ই বা হইবে। বলিতে ইচ্ছা করে, হে গিরীশ্বর, হে গণ ( পার্টি ) পতিগণ, যে যাহা চাও লও। বুকের-শিরা-ছিন্ন-করা-ভীষণ পূজাই যদি আত্মজনের মুক্তি দিবার একমাত্র বিধান হয়, তবে পরাজয় স্বীকার করিতেছি। যে ইংরাজ রাজত্বকে একদিন 'শয়তানী' নাম দিয়াছিলাম আজ তাহারই প্রতীক বড়লাটকে দেশের 'প্রধান নেতা' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। মান-অপমান-বোধ আজ আর নাই। মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, সে মুক্তি রাজকারা হইতে বাহির করিয়া নিত্য কারাগারে লইয়া যাইলেও তাহা শিরোধার্য।

বড়লাটি পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় দেশ-বিদেশের বহু লোক বলিতেছেন, কংগ্রেস অসহযোগ করিয়া এমন অসহযোগমনা হইয়া গিয়াছেন যে, সে শুভক্ষণ শুভ যোগ চিনিতে পারিল না। গুজরাতি প্রবচন আছে যে, 'ছুৎবায়ুগ্রস্ত লোককে স্বয়ং লক্ষ্মী টিকা পরাইতে আসিলেও সে অন্ধকূপের দিকে ছুটে মুখ ধুইবার জন্য'। অর্থাৎ কংগ্রেসের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে।

বড়লাটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়া রাজ্য-চালন করা। অর্থাৎ তাহার পর দেশে যে সব আইনজারী হইবে, যে সব ক্রিয়াকর্ম হইবে তাহার জন্য ভারতবাসী দায়ী হইবে। বিদেশে যে সব ভারতীয় সৈন্য যাইবে সে মিশরেই হউক ফলস্তীনেই হউক আর মালয়েই হউক, তাহারা আইনতঃ ভারতীয়—আর শুধু ভারতীয় নহে, স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আশীর্বাদ শিরে বহন করিয়া যাইবে; অথচ তাহাদের উপর কি আদেশ কখন হইবে তাহার নিয়ন্ত্রণাধিকার জাতীয়তাবাদীদের থাকিবে না। বিস্তর বাক্যবিন্যাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই, একবার ভাবিয়া দেখিলেই হয় যে, যদি মিশরী সৈন্যরা একদিন কলিকাতার জনতার উপর কোন কারণে গুলী চালায়, আর যদি তখন ওয়াফদীরা মিশরের শাসনকর্তারূপে বিরাজ করেন—সে শাসন আইনত ( ডি জুরে ) হউক কার্যতই ( ডি ফাক্টো ) হউক—তাহা হইলে প্রাতঃস্মরণীয় সাইজগলুল পাশা ও তাঁহার অনুবর্তিগণের প্রতি আমাদের কতটুকু ভক্তি থাকিবে?

সে যাহাই হউক। কথাটা তুলিলাম এই কারণে যে, যদিও পরাধীন জাতির কোনো পলিটিকস্ থাকিতে পারে না, একমাত্র স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া, তবু মিশর আরব পরাধীন ভারতবর্ষের নেতাদের ক্রিয়াকলাপের খবর রাখে। মিশরী ফলস্তনীরা আমাকে প্রায় বলিতেন, "আমাদের ক্ষুদ্র দেশ, আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিবার ক্ষমতা

রাখো। আর তোমরা যদি স্বরাজ পাও, তবে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যনীতির অবসান হইবে।" ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহাদের এই ভক্তি-উচ্ছ্বাস শুনিয়া তখন লজ্জা অনুভব করিয়াছি। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অসহিষ্ণু তাঁহারা স্পষ্ট বলিতেন যে, আমাদের পরাধীনতাই তাঁহাদের পরাধীনতাকে অটুট করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি কাবুলেও বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতিতে বিরক্ত আফগানদের মুখে শুনিয়াছি যে, আমাদের দৌর্বল্যই বৃটিশ রাজনীতিকে পুষ্ট করিতেছে ও আফগানিস্তানকেও তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। আমি তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা সব সময় মানি নাই; এস্থলে কিন্তু আমার এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করার উদ্দেশ্য এই যে কাবুল হইতে মিশর তুর্কী পর্যন্ত সব দেশের লোক আমাদের গতিবিধির পর্যালোচনা করে। আমরা সাধারণতঃ তাহাদের খবর রাখি না।

বড়লাটি পরিকল্পনা স্বীকার না করাতে যাঁহারা নিতান্ত মর্মাহত হইয়াছেন, তাঁহাদের শুধু এইটুকু আমার বলিবার ইচ্ছা যে যাঁহারা অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা সৃষ্টিছাড়া কিছু করেন নাই।

প্রথম ধরুন মিশর। মিশরের ওয়াফ্‌দ্‌ দল ভারতবর্ষের কংগ্রেস-লীগ অপেক্ষা অনেক বলীয়ান। সে দলকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যদি কাজে লাগাইতে পারে তবে তাহার যে কত সুবিধা হয়, তাহার খবর ওয়াফ্‌দ্‌ জানে সাম্রাজ্যবাদীও জানে। ওয়াফ্‌দ্‌ এত ভাল করিয়া জানে যে, যে-সব বিভীষণরা সাহায্য করিতে অত্যধিক মাত্রায় প্রস্তুত তাহাদের পরিষ্কার বলিয়া দেয় চাচা যেন আপন প্রাণ বাঁচায়। পাঠকের অজানা নাই যে, কেহ কেহ নিজের প্রাণটা ঠিক রক্ষা করিতে পারে নাই। ইংরাজের প্রভুত্বহীন মিশরে ওয়াফ্‌দ্‌ সর্বদাই রাজত্ব করে ও করিতে প্রস্তুত কিন্তু রাজা যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর ক্রীড়নক হইয়া পড়েন, তখন ওয়াফ্‌দ্‌ আর সহযোগ করিতে সম্মত হয় না। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ওয়াফ্‌দকে বলে, "তোমরা রাজত্ব চালাইতেছ না কেন? তোমাদের সঙ্গে আমাদের স্বার্থের অনেক মিল, সে কি বুঝিতে পারো না। এই ধরো না সুয়েজ খাল। তাহার কনট্রাক্ট তো প্রায় শেষ হইল, নূতন কনট্রাক্টে তোমাদিগকে অনেক কিছু দিতে হইবে, সেজন্য আমরা প্রস্তুত। তোমরা তো এখন আর দুগ্ধপোষ্য শিশু নহ, তোমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আমরা তো মানিয়া লইয়াছি। তোমরা মুরুব্বি, আইস সুয়েজখাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। হাঁ, আর সেই সুদানের ব্যাপারটা! হাঁ, হাঁ, সুদানও তোমাদের ফিরাইয়া দিতে হইবে বই কি। সে তো আমরা সর্বদাই বলি। তবে কিনা কোনও কোনও সুদানী (পাঠকের অবগতির

জন্য বলি এইসব সুদানী নূন মুদ্‌লেয়ার গোত্রীয় ) আপত্তি জানাইয়াছেন, মিটিং করিয়াছেন, ডেপুটেশন ভেজিয়াছেন। সে কথাটাও তো বিবেচনা করিতে হয়। তাই পরিষ্কার কিছু বলিতে পারিতেছি না। আর ছাই বলিবই বা কাহাকে? তোমরা যদি দেশের রাজ্যশাসনভার গ্রহণ না করো ( দিশি ভাষায় বড়লাটি লাঠি গ্রহণ না করো ), তবে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিব কি করিয়া, তোমাদের 'লুকস স্টাণ্ডি' কোথায় ( অর্থাৎ মুসলমানী ভাষায় তওবা করিয়া কুফর্ ইন্‌কার করো, বৈদিক ভাষায় হে ব্রাত্য যজ্ঞোপবীত ধারণ করো )?

আরে আরে, ও শ্যামদাস পালাস কেন? শোন্-ই না। সেই যে ইংরেজ পলটন মিশরে বসিয়া আছে। সত্যি ভাই, তাতে মিশরীদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে, আমরাও বুঝি। সে বিষয়েও একটা সমঝাওতার বড় প্রয়োজন। আহা কি মুশকিল, পালাচ্ছিস কোথায়?"

কিন্তু মুস্তফা নহ্‌হাজ্ পাশা ঘুঘু ছেলে। মুখের ভদ্রতা অন্তত উশকুরুকুম ( থ্যাঙ্ক্ ) পর্যন্ত না বলিয়া তিনি তুর্কী টুপির ফুন্না উড়াইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে আজহর মসজিদে আশ্রয় লন। এবং নহ্‌হাজ্ পাশার পিছনে থাকে তামাম দেশ—যাহারা থাকে না, তাহাদের বিপদের কথা পূর্বেই সভয়ে পেশ করিয়াছি।

মুস্তফা ও ওয়াফ্‌দীরা যে কত বড় লোভ সম্বরণ করিয়া সর্বপ্রকার সমঝাওতা, দরকষাকষি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করা শক্ত। সুয়েজ খাল, সুদান, ব্রিটিশ পলটন এই তিন প্রশ্নের সমাধান তাঁহাদের কাছে বৌদ্ধদের ত্রিশরণ অপেক্ষাও কাম্য।

ফলস্তীনের ( প্যালেসটাইন ) মত দুর্ভাগ্য দেশ পৃথিবীতে আমি কোথাও দেখি নাই। ইহুদী পঙ্গপাল দেশটাকে ছাইয়া ফেলিবার পূর্বে ( ১৯১৮ ) আরবদের সুখে দুঃখে দিন কাটিত—আফগানিস্থান যেমন তাহার দারিদ্র্য নিয়াও বাঁচিয়া আছে। ফলস্তীন তখন তুর্কীর অধিকারে ছিল ও খলীফার অধঃপতনের যুগে তাহার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির কোনও প্রকার চেষ্টা করা হইতেছিল না বলিয়া ফলস্তীন নবীনেরা স্বরাজ্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে আন্দোলনের নেতারা সফলতা লাভ করিতেন কি না-করিতেন সে প্রশ্ন অবান্তর—মূল কথা এই যে ফলস্তীন শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ থাকিলেও আপামর জনসাধারণ জাফা কমলানেবুর চাষ করিয়া নিজের জমিতে নিজের কুঁড়েঘরে জীবন যাপন করিত।

কুক্ষণে তাহারা লরেনসের ধাপ্পায় ভুলিল, কুক্ষণে তাহারা খাল কাটিয়া ঘরে

কুমির আনিল। সে ইতিহাস আজ আর তুলিব না। ইহুদীরা আসিয়া তাহাদের কোটি কোটি টাকার পুঁজির জোরে আরবদের ঘরছাড়া ভিটাছাড়া করিয়া এমন অবস্থায় পৌঁছাইল যে অবস্থায় মানুষ আর কিছু না করিতে পারিয়া দাঁত দিয়া কামড়ায়, নখ দিয়া ছিঁড়ে। পৃথিবীর সহানুভূতি ফলস্তীন পায় নাই, কারণ ইহুদীরা দুনিয়ার প্রেসের মালিক। তবু মনে আছে ১৯৩৪ সালে যখন আমি ফলস্তীনে বাস করিতেছিলাম তখন ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে আমি আরবদের বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের জাতীয়বাদীরা তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করেন। নিঃস্ব আর্ত আরবদের সেকথা শুনিয়া চক্ষে জল আসিতে আমি দেখিয়াছি। ফলস্তীনের বেদুইন চাষী হয়ত কংগ্রেস লীগ চিনে না কিন্তু আমি জানি যে সে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা খবর পাইয়াছেন যে, ভারতের নিপীড়িত জনসাধারণ কংগ্রেস ও লীগের ভিতর দিয়া আরবদের মঙ্গল কামনা করিয়াছে। দোহাই কংগ্রেস লীগের কর্তাগণ, যাহা খুশী কর কিন্তু তোমাদের আশীর্বাদ লইয়া যেন গুর্খা পাঠান শিখ মারাঠা ফলস্তীনে না যায়।

ফলস্তীন পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করিয়াছে। কিন্তু ইহুদীরা গণতন্ত্র চায় না যতদিন না দেশের লোক শতকরা ৫১ জন ইহুদী হয়। ততদিন দলে দলে ইহুদী আমদানি হইতেছে।

বয়তউল-মুকদ্দসের ( জেরুজালেমের ) ম্যুনিসিপ্যালিটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। তাহাতে যোগদান করিলে আরবদের অনেক ছোটখাটো সুবিধা হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যখনই তাঁহারা দেখিতে পান ক্ষুদ্র সহযোগের দ্বারা তাঁহাদের বৃহত্তর স্বার্থ স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে, তখনই তদ্দণ্ডেই তাঁহারা বড়লাটি দণ্ডকে হাতে লওয়া পণ্ডশ্রম মনে করেন। অসহিষ্ণু মহা-মুফতী তো ফ্যাসিস্ট দলেই যোগদান করিলেন। কিছুদিন হইল খবর আসিয়াছে, আরবরা মুকদ্দসে ম্যুনিসিপ্যালিটি বয়কট করাতে সরকার ছয়জন সিভিল কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

ফলস্তীনদের বাঙাল রাগ। বিশেষ অপবিত্র তরল দ্রব্য দ্বারা বরঞ্চ চিঁড়া ভিজায় তবু জল ব্যবহার করে না।

লেবানন সিরিয়া ফরাসীকে তাড়াইবার জন্য ইংরাজের সাহায্য লইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ভালো করিতেছে কি মন্দ করিতেছে—ফরাসীকে তাড়ানোর কথা হইতেছে, না ইংরেজের সাহায্য লওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে—আল্লাই জানেন। কণ্টক দিয়া কণ্টক উৎপাটিত করা হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শেষের কণ্টক যেন মুশল হইয়া বাহির না হয়। তখন যদুকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

তবু যেন কেহ মনে না করেন যে, লেবানন সিরিয়া আজাদ জিন্নার ব্যবহারে উষ্ণ হইয়া গোস্‌সা প্রকাশ করিবে। নিজেরাই তাহারা ফরাসী ষষ্টি বারম্বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। নীতি একই।

ইরাক ক্ষাত্রতেজে বলীয়ান। সেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের ডাল বেশিদিন গলিবে না। গত যুদ্ধের পর তাহারাই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদীদের অর্ধচন্দ্র দিয়াছিল। ইরাকেও অসহিষ্ণু নেতার অভাব ছিল না, এখনও নাই।

হে মাতঃ মুক্তি দাও যাহাতে রোরুদ্যমান হইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারি—হেন ক্রন্দনধ্বনি ইরানের ক্রন্দসী হইতে উত্থিত হইতেছে।

ইরানের স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রতি সকলেরই লোভ। রুশ সপত্নও হুঙ্কারধ্বনি ছাড়িতেছেন। যে রুশ একদিন মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উত্তর ইরানের স্বাধিকার ত্যাগ করিয়াছিল, সেই রুশই আজ ইরানের তেল চায়—কারণ তৈল একা আসে না। ঘৃত লবণ তৈলতণ্ডুল বস্ত্র ইন্ধন একসঙ্গে যায়। আজরবই-জানের প্রতি রুশের লোভ নাই একথা এত জোরে বলা হইতেছে যে, আমরা শেক্ষপীয়রী ভাষায় বলি—"মহারাজ, মহিলা বড় বেশী প্রতিবাদ করিতেছে।" রুশিয়া যে ইরানের প্রতি রুষিয়াছেন তাহাতে কোন বাতুল সন্দেহ করিবে না। কিন্তু কহি তবু তো ইরানের ইংরাজ প্রেম সঞ্চারিত হইতেছে না। ইরান ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল, "হে কর্তারা, যুদ্ধ তো শেষ হইয়াছে, তবে পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত বিদায় লইতেছ না কেন? তোমাদের জন্য আতর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি, আর কেন, আমাদের অনেক শিক্ষা হইয়াছে।" কিন্তু মুজঃফর ( বিজয়ী ) নগরের কম্বল ছাড়িবে কেন?

শুনিয়াছি ইরাণে নাকি ভারতীয় সৈন্য আছে। যদি থাকে তবে বড় ভাগ্য মনে গণি যে, ইহাদের কপালে বিজয়তিলক কংগ্রেস-লীগ অঙ্কন করেন নাই। লাঞ্ছন শ্বেত-গৈরিক-শ্যাম নহে।

আফিগানিস্থান সম্বন্ধে আলোচনা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। আমি সমরশাস্ত্রে নিতান্তই মূর্খ, সংখ্যাতত্ত্বে ততোধিক। যত আফগানযুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে কি পরিমাণ গোরা কি পরিমাণ পাঠান-গুর্খা-শিখ-মারাঠা ছিল জানি না।

আফগানিস্থানের ব্রিটিশ প্রীতি সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, আমি যখন কাবুলে ছিলাম তখন সমগ্র আফগানিস্থানে মাত্র কজন ইংরাজ ছিলেন এবং সকলেই ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের কর্মচারী। আফগানিস্থানের স্কুল-কলেজে তখন ফরাসী পড়াইতেন ফরাসী গুরুরা, জর্মন পড়াইতেন জর্মন গুরুরা, কিন্তু ইংরেজী

পড়াইতেন ভারতবাসীরা। আমি যখন শিক্ষামন্ত্রীকে বলিয়াছিলাম যে ইংরাজের প্রয়োজন, তা না হইলে ছাত্রদের উচ্চারণ ভালো হইবে না, তিনি মৃদু হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন, "কুরাণ তো আর ইংরেজী ভাষায় লেখা হয় নাই যে উরুশ্চারণের জন্য সায়েবদের মেলা তকলীফ্ দিয়া এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আনিতে হইবে।"

ইংরাজ তখন রুশিয়ার পাসপোর্ট বরঞ্চ পাইত, কিন্তু আফগানিস্থান! বরঞ্চ পঞ্চম মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতে পাইত, কিন্তু ইংরাজ লাণ্ডিকোটালের ঐ পারে পা দিতে গেলে নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইত।

ইংরাজ-রুশে বন্ধুত্ব হওয়ায় আফগানিস্থান মহা বিপদে পড়িয়াছে। হায় জালালাবাদ হায়, মজার-ই-শরীফ!

বড়লাটি লাঠি আমরা হাতে লইলে বেচারী পাঠানদের দুইখানা লাঠির খর্চার ধাক্কায় পড়িতে হইবে। সে কি উত্তম প্রস্তাব? কাবুলীদের ভদ্রতা-বোধ কম। ভারতবাসীদের তাহারা গোলাম বলে। গোলামের হাতে কি লাঠি শোভে? লাঠি বাজিবে না?

হাইলে সেলাস্মি সাম্রাজ্যবাদীদের অনুনয় করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া আর আদিস-আব্বাবার মত বর্বর শহরে থাকিয়া বিস্তর কষ্টভোগ না করেন। ইতালীয়রা হাবশীদের যথেষ্ট সভ্য করিয়া গিয়াছে, ঐটুকুতেই তাহাদের কাজ চলিবে। সাম্রাজ্যবাদীরা নাকি তথাপি 'শ্বেত ভদ্রতার' নামাইতে পারিতেছেন না। হাবশীদের হৃদয়ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, সহযোগ যষ্টি লইবার জন্য হস্তোত্তলন করিতেছে না।

তুর্কীরা অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাসীদের দিলিদোস্ত! কারণ কোন্ মূর্খ বলিবে যে, তুর্কী জর্মনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা না করিলে জর্মনী পরাজিত হইত। সে যুদ্ধে কি পরিমাণ লোকক্ষয়, বলক্ষয়, অর্থক্ষয় হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই তবে আশা করতে পারি ভারতবর্ষে যত পরাজিত জাপানী সমরবন্দী আছে, তুর্কীতে তাহা অপেক্ষা বেশী জর্মন বন্দী আছে। তবে সব সময়েই কি আর 'ফলেন পরিচিয়তে'। বরঞ্চ "ম ফলেষু" এইক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তৎসত্ত্বেও হায় রে তুর্কী তোমার দার্দানেলেজ যে যায়-যায়। মিত্রশক্তি যখন তোমাকে অনুনয়-বিনয় করিয়াছিল, তখন তুমি সাম্রাজ্যবাদীর যষ্টি হাতে নাও নাই, এখন তোমার সপ্ত-কৃশ-বৎসরের চক্র। কিন্তু বল তো আলেপ্পো, তোমাকে কে ভেট দিতেছে?

কিন্তু তুর্কী স্বাধীন। হিজাজের ইবনে সউদ স্বাধীন যমনের ইমাস ইয়হিয়া স্বাধীন। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা অসহযোগিতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ট্রেনসজর্ডানও গুছাইয়া লইয়াছে।

বুঝিতে পারিতেছি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির উপক্রম। আর বাক্যবিন্যাস করিব না। তবে আশা করি এইটুকু বুঝিতে কাহারো অসুবিধা হইবে না যে, বড়লাটি লাঠি ভারতীয়দের হাতে না আসায় দুঃখ করিবার কিছু নাই। কংগ্রেস-লীগ ভিন্ন ভিন্ন কারণে লাঠি নেন নাই বা পান নাই, কিন্তু আর যাহাই হউক, মধ্য প্রাচ্য সেজন্য তাঁহাদের নিন্দা করিবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা করিতেছে, তাহাতেই মনে হয় ভালো কর্মই করিয়াছি। আল্লা মেহেরবান, আমাদের অজানাতেই হয়ত আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দিয়াছেন।

## যুবরাজ-রাজা-কাহিনীর পটভূমি

তুলনাত্মক শব্দতত্ত্ব যেরূপ কোনো এক শুভদিনে আপাদমস্তক নির্মিত হয়নি ঠিক সেইরূপ তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব হঠাৎ একদিন জন্মগ্রহণ করেনি। গ্রীক রোমান ঐতিহাসিকরা যে-সব জাতির সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের ধর্মের বিবরণও অল্পবিস্তর দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এসব বিবরণের অধিকাংশই পক্ষপাতদুষ্ট। আর এঁদের ভিতর যাঁরা নাস্তিক ছিলেন তাঁরা নানা ধর্মের বিবরণ দেবার সময় সব কটাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, নিজেরটাকেও ব্যত্যয় দেননি, অর্থাৎ প্রতিচ্ছবির স্থলে কেরিকেচার এঁকেছেন। তথাপি যে পদ্ধতির গ্রন্থই হোক না কেন, এগুলোকে বাদ দিয়ে কোনো বিশেষ ধর্মের বা একাধিক ধর্মের ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব, এবং বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস রচিত না হওয়া পর্যন্ত তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্রের গোড়াপত্তনও অসম্ভব।

খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হওয়ার ফলে গ্রীক, রোমান তথা ইউরোপীয় অন্যান্য ধর্ম লোপ পায়। শুধু তাই নয়, ভিন্ন ধর্মের বিবরণ লেখার ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দী ধরে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়। আজ যাঁরা জানতে চান, গ্রীক, রোমান, ট্যুটনদের ধর্ম প্রাথমিক খৃষ্টধর্মের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তাদের তন্ন তন্ন করে গ্রীক ও রোমানদের সর্বপ্রকারের রচনা পড়তে হয় এবং সেখান থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন সেগুলোর সন্ধান নিতে হয় প্রাথমিক খৃষ্টধর্মের

কোন্ কোন্ আচার অনুষ্ঠানে এরা নির্বিঘ্নে অনুপ্রবেশ করেছে, কিংবা খৃষ্টধর্ম গ্রন্থের অনুশাসন উপেক্ষা করে নবদীক্ষিত খৃষ্টানগণ নিজেদের প্রাক খৃষ্টীয় আচার অনুষ্ঠান নূতন ধর্মে কিভাবে এবং ইয়োরোপের কোন্ কোন্ জায়গায় প্রবর্তন তথা সংমিশ্রণ করেছে—এইসব তাবৎ তথ্য প্রভূত পরিশ্রম তথা গভীর গবেষণা দ্বারা সঞ্চয় করে তবে খৃষ্টধর্মের সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা সম্ভব। আজ যে-রকম ভারতীয় চার্বাক প্রভৃতির লোকায়ত দর্শন পুনর্নির্মাণ করা অতিশয় সুকঠিন কর্ম।

সপ্তম শতাব্দীতে নবজাত ইসলামের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের সংঘর্ষের ফলে একে অন্যের ধর্মের বিরুদ্ধে রূঢ়তম কুৎসা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু মুসলমানদের বাধ্য হয়ে অনেকখানি সংযত ভাষা ব্যবহার করতে হল কারণ পবিত্র কুরানে খৃষ্টকে আল্লার প্রেরিত-পুরুষ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, ক্রুসেডের নৃশংস যুদ্ধ সত্ত্বেও দুই ধর্মের গুণীজ্ঞানী একে অন্যের বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। আরবরা ব্যাপকভাবে গ্রীক দর্শন পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র আরবীতে অনুবাদ করলেন ও পরবর্তীকালে আরব দর্শনশাস্ত্রের লাতিন অনুবাদ ইয়োরোপে প্রচার ও প্রসার লাভ করলো। এবং এ-স্থলে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে আরব (ও পরবর্তীকালে ইরানের) সূফীপন্থা (ভক্তিবাদ ও রাজযোগের সমন্বয়) খৃষ্টীয় মিস্টিজিম বা রহস্যবাদের সঙ্গে বারম্বার নিবিড় সংস্পর্শে এল এবং ফলে একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারিত করলো। কোনো কোনো ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বিশ্বাস করেন, ইতিমধ্যে ভারতীয় রহস্যবাদ আরব সূফীতত্ত্বকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

এ-স্থলে স্পেনবাসী আরব ধর্মপণ্ডিত ইব্‌ন্ হজ্‌ম-এর উল্লেখ করতে হয়। তিনি ইহুদি, খৃষ্ট ও ইসলাম নিয়ে অতি গভীর আলোচনা করেন, কিন্তু পুস্তকখানা যদিও বহু বহু স্থলে অমূল্য রত্ন ধারণ করে, তবু পূর্ণ পুস্তক পক্ষপাতদুষ্ট। ইব্‌ন্ হজ্‌মের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সপ্রমাণ করা: ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম এবং শুধু তাই নয়, ইসলামে যে শতাধিক শাখা-প্রশাখা বহুবিধ সেক্‌ট্, 'স্কুল্‌স্' আছে, তার মধ্যে তিনি নিজে যেটিতে জন্মগ্রহণ করেন সেইটিই সর্বোৎকৃষ্ট বটে ও সর্বগ্রাহ্য হওয়া উচিত।

এক হাজার বছর পূর্বেকার গজনীর বাদশা মাহমূদের সভাপণ্ডিত আলবীরুনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যদিও তিনি মূলত তাঁর "ভারতের বিবরণ" গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম, তার নানা শাখা-প্রশাখা, আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার, কিংবদন্তীর বয়ান দিয়েছেন এবং যেহেতু ভারতীয় ধর্ম মাত্রই কোনো না কোনো দর্শনের দৃঢ়ভূমির

উপর নির্মিত, তিনি তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন সাতিশয় নৈপুণ্যসহ বিশ্লেষণ করেছেন। এবং স্থলে স্থলে ইসলামের সঙ্গে তুলনাও করেছেন। প্রতিমানাশক, কট্টরতম মুসলমান মাহমুদের সভাপণ্ডিত কোনো স্থলে হিন্দু ধর্মের বিশেষ কোনো মতবাদ বা আচারের প্রতি দৈবাৎ সহানুভূতি প্রকাশ করলে সেটা যে তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে সাতিশয় উপকারী হত না সেটা সে যুগের রাজ-জহ্লাদ ভিন্ন অন্যজনও নিঃসঙ্কোচে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতো। তৎসত্ত্বেও পরম আশ্চর্যের বিষয় তিনি ইসলামের প্রতি সরল অনুরাগ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্মের প্রশংসনীয় দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং কোনো কোনো নিন্দনীয় আচারের কারণ দেখিয়েছেন। পাঠক মাত্রই সহজে প্রত্যয় করবেন না, যে-মাহমুদ হিন্দুর প্রতিমা ভঙ্গ করাটা অতিশয় শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করতেন তাঁরই সভাপণ্ডিত আভাসে ইঙ্গিতে এবং তুলনার সাহায্যে প্রতিমা পূজার পিছনে যে হেতুটি রয়েছে সেটা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক সেটা বুঝিয়ে বলেছেন। এ-স্থলে জরাজীর্ণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে সংক্ষেপে সেটি নিবেদন করি : মক্কা গমনে সম্পূর্ণ অসমর্থ অথচ হজ পালন করা যখন তার একমাত্র অবশিষ্ট কাম্য, সেই অর্ধমৃতজনকে যদি কেউ মক্কার একখানা ছবি দেখায় তবে কি তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হবে না, অশ্রুজল দুই চক্ষু সিক্ত করবে না, কম্পিত কলেবরে সে হজকামী ছবিখানাকে হয়তো বারম্বার চুম্বন দিতে আরম্ভ করবে এবং হয়তো বা যুক্তিতর্কের বিধান বিস্মৃত হয়ে সেই অতি সাধারণ জড় কাগজখণ্ডকে অলৌকিক দৈবশক্তির আধার বলে সম্মান প্রদর্শন করতে আরম্ভ করবে! অতএব যে স্থলে কলায় সুনিপুণ শিল্পী বহুমানবের ধারণা সাধনাকে মৃন্ময়রূপ দিতে সক্ষম হন, সে-প্রতিমার সম্মুখে কি সাধারণ মানুষ নতজানু হবে না? অবশ্য গোড়াতেই আলবীরুনী প্রতিমা পূজার প্রতি আপন বিরাগ প্রকাশ করেছেন। এস্থলে স্মরণীয় যে অস্মদ্দেশীয় বহু বেদান্তবাগীশ তথা ব্রহ্মসমাজ প্রতিমা-পূজা সমর্থন করেন না। অন্যান্য অনেকেই এ-মার্গকে নিম্নস্তরে স্থান দেন।

পাঠান যুগে যদিও নিজামউদ্দীন আউলিয়া প্রভৃতি চিশ্‌তী সম্প্রদায়ের সুফী ভাবাপন্ন সাধুগণ অতিশয় পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন বলে যে-কোনো ব্যক্তি আপন ধর্ম ত্যাগ না করে তাঁদের শিষ্য হতে পারতো, তথাপি ব্যাপকভাবে উভয় ধর্ম নিয়ে বিশেষ কোনো চর্চা হয়েছে বলে এ অক্ষম লেখকের জানা নেই। তবে নিজামউদ্দীনের শিষ্য ও সখা সুকবি আমীর খুসরো ভারতের প্রচলিত ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন।

পাঠান রাজবংশ ভারতে বাস করার ফলে ক্রমে ক্রমে মার্জিত রুচিসম্পন্ন হয়ে যান। তাঁদের তুলনায় সে যুগের মোগলদের বর্বর বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বাবুর অসাধারণ মেধাবী, বহুগুণধারী পুরুষ। কিন্তু যদিও তিনি তাঁর রোজনামচায় ঘন ঘন আল্লাতালার নাম স্মরণ করেছেন, সেজন্য তাঁকে সত্য ধর্মানুরাগী মনে করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না ( ইংরেজ প্রতিদিন পাঁচশ' বার "থ্যাঙ্কু" আওড়ায় ; অতএব তার কৃতজ্ঞতাবোধ, উপকারীর প্রতি তার আনুগত্য আমাদের চেয়ে পাঁচশ' গুণে বেশী এহেন মীমাংসা বোধ হয় সমীচীন হবে না )। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম-নিন্দিত একাধিক ব্যসনে অত্যধিক আসক্ত তিনি তো ছিলেনই, তদুপরি যুদ্ধজয়ের পর তিনি যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ইসলামের মূল সিদ্ধান্ত অনুশাসন লঙ্ঘন করে উৎপীড়ন, বর্বরতম পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ সমাপন করেছেন, সে-সব তিনি সগর্বে নিজেই আপন রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বস্তুত এক কথায় বলা যেতে পারে, ইসলামে দীক্ষিত বাবুরাদি তুর্কমান ( মোগল নামে এদেশে পরিচিত ) ইসলাম সেভাবে গ্রহণ করেনি, বাঙলাদেশের মুসলমান যেরকম হৃদয় দিয়ে করেছে। আর মোগল রাজাদের ভিতর এক ঔরঙ্গজেব ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন স্বধর্ম ইসলামের প্রতি উদাসীন, একাধিকজন সিনিক্ এবং প্রায় সকলেই কি ইসলাম কি হিন্দুধর্ম সব ধর্ম ব্যবহার করেছেন অস্ত্ররূপে রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য।

হুমায়ুনের জীবন এতই সংগ্রামবহুল যে তিনি অন্য কোনো বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করতে পারেননি। আপন যুবরাজ সম্পূর্ণ নিরক্ষর রইলেন তাঁরই চোখের সামনে।

নিরক্ষরজন যে অশিক্ষিত হবে এমন কোনো আপ্তবাক্য নেই।

নিরক্ষরজন সম্বন্ধে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু সে সাক্ষর হয়ে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাস করেনি তাই কোন্ পুস্তক উত্তম আর কোন্টা অধমাধম, কোন্টা সত্য আর কোন্টা নিছক বুজরুকী, এক কথায় তার মূল্যায়নবোধ বিকশিত হয় না। তারই ফলে দেখা যায় নিরক্ষরজন সাধারণত আপন স্বার্থের সামগ্রী ভিন্ন অন্য কোনো বাবদে বিশেষ কৌতূহলী নয়। পক্ষান্তরে এটাও মাঝে মাঝে দেখা যায় যে কোনো কোনো নিরক্ষরজনের বিধিদত্ত জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সে সাক্ষর হয়ে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসের রীতি অনুযায়ী উত্তম অধম নানাবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করেনি। ফলে তার মূল্যায়নবোধ যথোপযুক্ত-রূপে বিকাশলাভ করতে পারেনি।

আকবর এরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হিসেবে তিনি উত্তম-রূপেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভারতের সর্বপ্রধান সনাতন হিন্দুধর্ম, ইসলাম, দুই ধর্মের শাখাপ্রশাখা এবং হিন্দু-মুসলমান সাধুসন্ত সর্বধর্মের মিলন সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যে-সব "পন্থা" প্রচার করেছেন এগুলোর কোনো একটা সমন্বয় না করতে পারলে সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে যে কোনো দিন মোগল বংশ সিংহাসনচ্যুত হতে পারে। অতএব আহ্বান জানালেন, সর্বধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের। এমন কি যে-জৈনদের সংখ্যা ভারতে নগণ্য এবং সে-যুগে তারা প্রধানত গুজরাত, কাঠিয়াওয়াড ও মারওয়াড় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁদেরও প্রধানতম জৈন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ জানালেন। তিনি অতি সুন্দর ভাষায় জৈনধর্মের মূল সিদ্ধান্ত এবং বিশেষ করে জীবে দয়া সম্বন্ধে আম-দরবারে বক্তৃতা দিয়ে মায় আকবর সভাজনকে মুগ্ধ করলেন। ওদিকে আকবর ছিলেন ছিদ্রান্বেষী তথা "ইনসাইড স্টরি" জানবার জন্য মহা কৌতূহলী এবং তিনি জানতেন, হিন্দু এবং জৈনদের মধ্যে একটা আড়াআড়ি ভাব আছে। রাত্রে ডেকে পাঠালেন হিন্দু পণ্ডিতকে। তিনি বললেন, "জৈন গুরু যে এত লম্ফঝম্প করলেন তাঁকে শুধোবেন তো মহারাজ, এ-প্রবাদটির অর্থ কি—

"হস্তীনা তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ জৈন মন্দিরম্।

হস্তী কর্তৃক বিতাড়িত হলেও জৈন মন্দিরে ( বা গৃহে ) প্রবেশ করে না।"

আকবর পরদিন প্রশ্নটি শুধানোর পর জৈন গুরু মৃদু হাস্যসহকারে বললেন, "আমি যদি উত্তরে বলি

"হস্তীনা তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ ( শৈব ) মন্দিরম্[১]

হস্তী কর্তৃক বিতাড়িত হলেও শৈব মন্দিরে ( বা শৈবের গৃহে ) প্রবেশ করো না। তা হলে ছন্দপতন হয় না, অর্থও তদ্বৎ—শুধু জৈনের পরিবর্তে শৈবের কুৎসা করা হয়। বিদ্বেষপ্রসূত এ-সব প্রবাদের কোনো সত্যমূল্য নেই।"

আকবর রাজনৈতিক কারণে, নিজ স্বার্থে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বিবরণ শোনার পর স্বয়ং একটি নবীন 'ধর্ম' প্রচার করতে চেয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, "ইসলামের হজরৎ নবী ছিলেন নিরক্ষর, আমিও নিরক্ষর। তদুপরি আমার হাতে রাজদণ্ড। আমা দ্বারা এ-কর্ম সফল হবে না কেন?" সে যা-ই হোক, তিনি

---

১। অধমের সংস্কৃত জ্ঞান এতই অল্প যে তার জন্য ক্ষমাভিক্ষা করতেও লজ্জা বোধ করি। বানানে নিশ্চয়ই একাধিক ভ্রম আছে। পাঠক নিজ গুণে শুধরে নেবেন। কাহিনীটিও স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে লিখেছি।

তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ সন্ধানীজন নন। তবে এ-কথা অতি সত্য যে তিনি সর্বধর্মের সর্বগুরুকে বাদশাহী নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাজদরবারে আসন দেওয়ার ফলে ধর্ম বাবদে মোগল রাজসভা অনেকখানি সঙ্কীর্ণতা-মুক্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে "সর্বধর্মজিজ্ঞাসা"র পন্থাটি সুখগম্য করে তোলে।

জাহাঙ্গীর সর্ব বিষয়েই ছিলেন উদাসীন—যা অত্যধিক মদ্যাসক্তজনের প্রায়শ হয়ে থাকে।

শাহজাহানের মতিগতি বোঝা কঠিন। সুবৃহৎ লালকেল্লাতে কত না রঙমহল, কত না হাম্মাম, সম্পূর্ণ একটি হট্ট, কত না নিষ্কর্মা এমারৎ, নহবৎখানা, বন্দীশালা, এবং দুই বিরাট সভাগৃহ। অথচ বেবাক ভুলে গেলেন (?) দুর্গবাসীদের পাঁচ বেলা নামাজ পড়ার জন্য একটি ছোটাসে ছোটা মসজিদ বানাতে! দিল্লীর দারুণ গ্রীষ্ম এবং নাকেমুখে আঁধির ধুলো খেতে খেতে তাদের দ্বিপ্রহরে যেতে হত জামি মসজিদে। দিল্লীর কাঠ-ফাটা শীতের রাত্রে এশার নমাজ পড়তে।

তা সে যাই হোক, তিনি অদ্ভুত একটা একস্‌পেরিমেণ্ট করেছিলেন তাঁর চার পুত্রের শিক্ষা ব্যবস্থায়। এক পুত্রকে স্পেশালাইজ করালেন রণকৌশলে, অন্যকে সঙ্গীতাদি চারুকলায়, কনিষ্ঠ ঔরঙ্গজেবকে ছেড়ে দিলেন কট্টর মোল্লাদের হাতে এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয় জ্যেষ্ঠ দারা শীকূহকে শেখালেন সর্বধর্ম সর্ব সম্প্রদায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন।

* * *

সর্বধর্ম চর্চা করার জন্য মোল্লাদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও আকবর যে-পথ সুগম করে দিয়ে সর্বধর্মগুরুকে রাজসভায় ডেকে এনে বসিয়েছিলেন, সেই সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম দুই পুরুষ ধরে ছিল অনাবৃত অবহেলিত। দারা স্বয়ং সে পথ দিয়ে যাত্রারম্ভ করলেন। এবং শুধু তাই নয়, আকবরের কালে মৌলভী সাহেব সভাস্থলে প্রচার করতেন ইসলাম, হিন্দু পণ্ডিত প্রচার করতেন হিন্দুধর্ম, যে যার আপন ধর্ম—দারা সম্মুখে আদর্শ ধরলেন সর্বশাস্ত্র মূল ভাষাতে অধ্যয়ন করে, ব্রাহ্মণসন্তান যে রকম সংস্কৃত অধ্যয়ন করে, মুসলিম-সন্তান যে-রকম আরবী ভাষা আয়ত্তে আনে—তিনি একাই যেন সর্বধর্মের মুখপাত্র হতে পারেন। কিন্তু এস্থলে একটি বিষয়ে আমাদের মনে যেন কোনো দন্দ্ব না থাকে, দারা কোনো নবধর্ম প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা তথা অনুবাদকর্মে লিপ্ত হননি। আকবর যে পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন সেটা দারার মনঃপূত হয়নি। আকবর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বিবরণ শোনার পর প্রত্যেক ধর্মের কতকগুলো সিদ্ধান্ত, যেগুলো ঐ ধর্মের প্রত্যেককে বিনা

যুক্তিতর্কে মেনে নিতে হয় অর্থাৎ ডকট্রিন, শিবলেথ এবং ঐ ধর্মের অবশ্য করণীয় আচার-অনুষ্ঠান—রিচুয়াল এ-দুটি অঙ্গের উপর দিলেন প্রধান জোর ; ডকট্রিন এবং রিচুয়াল। অতঃপর আকবর সর্ব প্রধান প্রধান ধর্মের সর্ব ডকট্রিন ও রিচুয়াল সংগ্রহ করে বিচার করে দেখলেন এর কোন্-কোন্গুলো এ-দেশের জনসাধারণে প্রচলিত ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়েই আছে, কোন্-কোন্গুলো আপন ধর্মে না থাকা সত্ত্বেও সে ধর্মের লোক ঐগুলো আপত্তিজনক বলে মনে করে না এবং কোন্ কোন্গুলো ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ, কলহ এমন কি রক্তপাত পর্যন্ত ঘটিয়েছে। বিচার-বিবেচনার পর তিনি তাঁর নবীন ধর্মে এমন সব ডকট্রিন ও রিচুয়েল নিলেন যেগুলো সবধর্মগ্রাহ্য হয়েই আছে এবং যেগুলো হওয়ার সম্ভাবনা ধরে।

দারা এ-পথ নিলেন না। তিনি বিচার করে দেখলেন, প্রত্যেক ধর্মের অন্তত কয়েকজন গুণী আপন আপন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এবং অল্প-সংখ্যক ধর্মানুরক্তজনের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকলেও সেগুলি প্রাণবন্ত, ডায়নেমিক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি মুগ্ধ হলেন হিন্দুর উপনিষদের গভীরে প্রবেশ করে। তসওউফ বা সুফীতত্ত্বকে তিনি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে দৃঢ়বিশ্বাস রাখতেন—ইসলামের সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর। এবং নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, দুই সাধনার ধারাই সম্মিলিত হয়েছে একই সিন্ধুতে। তাই তাঁর উপনিষদ-সাধনা পুস্তকের নামকরণ করেছিলেন—দ্বিসিন্ধু মিলন—মুজম্ উল্ বহ্‌রেন্। সেযুগে দুই ভিন্ন ধর্মের সাধক একান্তে বসে ধর্মালোচনা করতেন না—বস্তুত আপন ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের যে বিশেষ ভাষা হয় সেটা অন্যজনের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অবোধ্য।

দারার আশা ছিল, উপনিষদ সযত্নে ফার্সী ভাষাতে অনুবাদ করলে মুসলিম তত্ত্বজ্ঞানী সুফী উল্লাসে 'ইউরেকা' শব্দ দ্বারা 'আপন' আবিষ্কারজনিত হর্ষপ্রকাশ করবেন।

দারার বিশ্বাস ছিল, যদিও আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুর পুরোহিত তথা মুসলমানের মোল্লা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেন, তথাপি তাঁদের মূল উৎস দুই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী যারা তাঁরাই।

মুসলিম সুফী একবার হিন্দুর উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁর ও হিন্দু ব্রহ্মবাদীর মাঝখানে তো কোনো অন্তরাল থাকবে না—কুৎসা-কলহের তো কথাই ওঠে না। ফলে এঁরাই পুরোহিত মোল্লাদের যে নূতন অনুপ্রেরণা দেবেন, তারই ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শাশ্বত মিলন স্থাপিত হবে।

নিয়তি দারাকে আপন কর্ম সমাপ্ত করতে দিলেন না। নইলে তিনি যে হিন্দুর বিচিত্র সব মণিমানিক্য মুসলমানের সামনে এবং মুসলিম জওহর-জওয়াহির হিন্দুর সম্মুখে ক্রমে ক্রমে তুলে ধরতেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতেরই নিয়তি, বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হলেন না, শঙ্করাচার্যের আয়ুষ্কাল তো মাত্র বত্রিশ, চৈতন্যের বিয়াল্লিশ। রামমোহন দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি হাত দিলেন একই সময়ে সর্বকঠিন দুটি কর্মে, যার একটাই যে-কোনো কালের যুগশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমকে নিঃশেষ করে দেয়—ধর্ম সংস্কার এবং সমাজ সংস্কার যুগপৎ! তদুপরি তাঁকে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আরো বহুবিধ কর্মে লিপ্ত হতে হয়; সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয়, পাদ্রী মোল্লাদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে তাঁর কালক্ষয় হয় প্রচুর।

দারা ও রামমোহনের উভয়েরই শিক্ষার বাহন ফার্সী, সংস্কৃত এবং আরবী। দীক্ষা দুজনার ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু উভয়েই মিলিত হয়েছিলেন উপনিষদের একই সিন্ধুতে। অতএব দারার গ্রন্থ 'মুজম উল-বহরেন' এই উভয় সাধকের বেলাও প্রযোজ্য। অপিচ রামমোহনের ফার্সীতে লিখিত প্রথম কেতাব 'তুহাফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন'—'একম এবং অদ্বিতীয়মে বিশ্বাসীজনের প্রতি সওগাৎ যদি কাউকে উৎসর্গ করতে হয় তবে রাজার সঙ্গে একই তীর্থের যাত্রী রাজপুত্র দারাকে। রামমোহনের প্রথম পুস্তক ফার্সীতে এবং দারার পুস্তকও ঐ ভাষায় এবং উভয়ের পুস্তকের শিরোনাম আরবীতে। দুজনাই পুস্তক লিখেছেন মুসলমান সাধকের উদ্দেশ্যে। দারা আপন বক্তব্য বলেছেন উপনিষদ মারফৎ, রামমোহন তাঁর যুক্তিতর্ক সঞ্চয় করেছেন ইসলামের ভাণ্ডার থেকে। দুই পুস্তকই ধর্ম ও দর্শনের সংমিশ্রণ। আরো বহুক্ষেত্রে দুজনার ঐক্য, একাত্মবোধ ধরা পড়ে—শুধু লক্ষ্যবস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গীতেই নয়।

নেতির দিক দিয়ে দেখলে যে-সাদৃশ্য চোখে পড়ে সেটি বিস্ময়কর। কেউই কোনো নূতন ধর্ম প্রচার করেননি, করতে চাননি।

দারা এবং রাজা সম্বন্ধে গত ত্রিশ বৎসর ধরে যে-সব গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশ—অধিকাংশ কেন, শতাংশের একাংশ পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। গ্রহচক্রে আমি সে মণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। তাই এই রচনায় বিস্তর ত্রুটিবিচ্যুতির অবকাশ অনিবার্য। তবু কেন যে বার্ধক্যে এই অর্বাচীনসুলভ অপকর্ম করলুম সে তত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় অবগত আছেন। পাঠককে জানিয়ে কোনো লাভ নেই। লেখকের ভুলভ্রান্তি তার চক্ষুগোচর হলে সে অকৃপণ হস্তে হতভাগ্যের কর্ণমর্দন করার সময় আদৌ কর্ণপাত করে না—বেচারা লেখকের ওজুহাত-অছিল

তথা করুণকণ্ঠে তার ক্ষমাভিক্ষার প্রতি।

সৈয়দ মুজতবা আলীর এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধ রচনার একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। প্রবন্ধটি রচনার তারিখ ১৯৭৩ সনের ৩০ জানুয়ারি। ওই বছরটি ছিল রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকীর বছর। ইন্দো-ইটালিয়ান সোসাইটির বর্তমান সম্পাদক শ্রীরবিউদ্দীনের (যিনি কাজী নজরুল ইসলামের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ইউরোপ যাবার সময় কবির একান্ত সচিব ছিলেন) প্রচেষ্টায় রাজা রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরের সন্নিকটস্থ নতিবপুর গ্রামে ওই উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল রাজা রামমোহন ও যুবরাজ দারাশীকুহ্র উদার সহনশীল সমন্বয়ধর্মী কর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা। ওই সভার সভাপতি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু বসু। ওই আলোচনা সভার জন্য এই অবন্ধটি রচনা করেন সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর একান্ত স্নেহভাজন ডাক্তার মহম্মদ আব্দুল ওয়ালীর বিশেষ অনুরোধে এবং আলী সাহেব এই প্রবন্ধটি পড়বার দায়িত্বও ডাক্তার ওয়ালীর উপর ন্যস্ত করেন।

## যোগাযোগ

নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ করার উপলক্ষে যে কোনো জাতিরই উল্লসিত হওয়ার কথা; বিশেষত যে জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে, যে জাতি অতীতে মানব-সংসারে জ্ঞানের চিরন্তন দেয়ালি উৎসবে বহু প্রদীপ জ্বালিয়েছে, তার স্বরাজ্যলাভে পৃথিবীর বিদগ্ধ সম্প্রদায়েরও নিরঙ্কুশ আনন্দ হওয়ারই কথা। যে জাতি একদিন উপনিষদের দর্শন দিল, তথাগতের অমৃতবাণী শোনালো, গীতার সর্বধর্মসংমেলন শিখালো, ত্রিমূর্তি নির্মাণ করলো, তাজমহলের মর্মর স্বপ্ন দেখালো, তার কাছ থেকে পৃথিবীর গুণীজ্ঞানীরা এখন অনেক কিছুই আশা করবেন। স্বাধীনতা লাভের পর এখন আর তাদের নিরাশ করবার কোনো ওজুহাত আমাদের রইল না। এখন আর ইংরেজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আমরা রেহাই পাবো না।

সাংস্কৃতিক বৈদগ্ধ্যের নবজীবন লাভ অনেকখানি নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুসামঞ্জস্যের উপর। দারিদ্র্য যদি না ঘোচে, শক্তির সাধনায় স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা যদি খাদ্যের পরিবর্তে আগ্নেয়াস্ত্র সঞ্চয়ে মনোযোগ দিয়ে দেন, তাহলে যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-কলা-দর্শন এ-দেশে পুনরায় বিকশিত হবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। হিটলারের জর্মনি, স্তালিনের রুশিয়া যে বিশ্বমানবকে হতাশ করেছে, সে কথা

কারো অজানা নয়।

মহাত্মা গান্ধী যখন আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন, তখন আমরা ভয় করেছিলুম যে হয়ত বা আততায়ীর শক্তি সম্প্রদায় তাবৎ দেশটাকে গ্রাস করে নব নব হিটলার, নব নব স্তালিনের দাস্যগ্রহণ করবেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা সে 'মহতী বিনষ্টে'র হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি, আমাদের চরম সান্ত্বনা যে দেশের আপামর জনসাধারণও সে নিষ্কৃতির কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছে।

পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমরা শান্তি ও মৈত্রীর কামনা করি, কোনো দেশ জয় করার কামনা আমাদের নেই, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সংযুক্ত করার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই, এ বড় কম কথা নয়। কারণ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের ভৌগোলিক অবস্থা এমন যে, একমাত্র পাকিস্তান ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তাই আশা করতে পারি, আজ না হোক কাল নেতাদের সর্বপ্রচেষ্টা দেশের অভাব-অঘটন মোচন করাতে নিয়োজিত হবে।

কিন্তু তাই বলে এ-কথা বলা চলে না যে, দেশের দারিদ্র্য না ঘোচা পর্যন্ত সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে আমাদের বীজ পোতার প্রয়োজন নেই, ফসল ফলাবার ত্বরা নেই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এই তিন প্রচেষ্টাই একই সঙ্গে চালাতে হয়—অবস্থার তারতম্যে বিশেষ জোর দেওয়া বিশেষ কোনো অঙ্গে, এই মাত্র।

ভারত এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব যে বিকট রুদ্র রূপ নেবে না, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়ার পরও প্রশ্ন থেকে যায় সংস্কৃতির দিক দিয়ে এই দুই রাষ্ট্রের যোগাযোগ থাকবে কি থাকবে না, এবং যদি থাকে তবে সেটি কি প্রকারের হবে।

একটা দৃষ্টান্ত পেশ করি। সকলেই জানেন, প্যালেসটাইনের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ট্রান্সজর্ডান এবং তার প্রতিবেশী সউদী আরব যে পালেসটাইনের আরবকে ইহুদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো সাহায্য করতে পারল না, তার প্রধান কারণ আমীর আবদুল্লা ও ইবনে সউদের শত্রুতা। আমীর আবদুল্লার ভয় ছিল যে তিনি যদি সর্বশক্তি নিয়ে প্যালেসটাইন আক্রমণ করতে পারেন, আবদুল্লার পক্ষে উভয় রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা অসম্ভব হবে—হিটলারও পারেননি এবং ফলে তাঁর দুই কূলই যাবে।

কিন্তু তাই বলে ট্রান্সজর্ডান ও সউদী আরবের কৃষ্টিগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। কাবাশরীফের চতুর্দিকে ধর্ম সম্বন্ধে আরব তথা অন্য দেশবাসী শেখরা প্রতিদিন যে বক্তৃতা দেন, সেগুলোতে ট্রান্সজর্ডানের অধিবাসীরা আগেরই মত হাজিরা দিয়েছে এবং আম্মানে লেখা কেতাব মক্কাতে পূর্বেরই ন্যায় সম্মান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, মক্কা এবং আম্মান উভয় শহরের বিদ্যার্থীরাই কাইরোর আজহরে গিয়ে আগেরই মত পড়াশোনা করেছে। ইবনে সউদ মক্কা দখল করার পর বহু বৎসর পর্যন্ত মিশর-মক্কায় মনোমালিন্য ছিল—এমন কি মিশর থেকে কাবাশরীফের বাৎসরিক গালিচা আসা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের মক্কা-মদনওয়ী ছাত্রাবাস বন্ধ হয়ে যায়নি কিংবা ছাত্রেরও অপ্রাচুর্য হয়নি—মিসরে ছাপা ইমাম আবু হনিফার ফিকার কিতাব আগেরই মত মক্কার বাজারে বিক্রয় হয়েছে।

আরব-ভূমি আজ কত ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত, তবু যখন আজহরে পড়তুম, সব রাষ্ট্রের ছেলেদের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়েছে, তাদের আপন আপন হস্টেলে গিয়েছি, সকলে মিলে বাজার থেকে মুর্গী কিনে এনে হৈ-হুল্লোড় করে রান্না করে খেয়েছি। বিশ্বাস করবেন না, রান্নার সর্দার ছিলো মালদ্বীপের একটি ছেলে—মালদ্বীপ কোথায়, সে কথাই বহু ছাত্র জানতো না।

এইবার গোটা দুই ইয়োরোপীয় উদাহরণ পেশ করি। ভাষা এবং কৃষ্টির দিক দিয়ে দেখতে গেলে ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাংশ পড়েছে সুইটজারল্যাণ্ডের ভিতর। উত্তরাংশের খানিকটা পড়েছে লুক্সেম্বুর্গের ভিতর এবং আরো খানিকটা বেলজিয়ামের ভিতর। এ-সব দেশের লোকেরা আপন আপন রাষ্ট্রের প্রতি সর্বান্তঃকরণে আনুগত্য স্বীকার করে—ফ্রান্সও কখনো বলে না, এসব ফরাসী-ভাষী ভূখণ্ডগুলো লড়াই করে দখল করবো। অথচ কৃষ্টিগত আদান প্রদান এই তিন ভূমিতে হামেশাই চলেছে। প্যারিসে আঁদ্রে জিদের বই যে-দিন বেরোয় ঠিক সেই দিনই সে-বই জিনিভা, লুক্সেম্বুর্গ এবং ব্রাসেল্‌সে কিনতে পাওয়া যায়। জিনিভার বড় প্রকাশকরা প্যারিসে ব্রাঞ্চ রাখে, ব্রাসেল্‌সের প্রকাশকরা জিনিভায় আপন শাখা খুলতে পারলে খুশী হয়।

কিন্তু ঢাকার সাহিত্যামোদী এবং প্রকাশক হয়ত বলবেন, 'আমরা কলকাতার ধামাধরা হয়ে থাকতে চাইনে, কাজেই এ উদাহরণটা আমাদের মনঃপূত হল না।'

উত্তরে ভিয়েনা-বার্লিনের দৃষ্টান্ত পেশ করবো। দুই শহর দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী। কেউ কারো চেয়ে কম নয় এবং এককালে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির (মায়

যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ) প্রতাপ জর্মনির চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। দু'শহরের লোকই জর্মন বলে, জর্মন থিয়েটার দেখে, জর্মন অপেরা শোনে। ভিয়েনাতে কোনো নাট্য-সমঝদারের সাবাসী পেলে সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যকার, অভিনেতা এবং নর্তক-নর্তকীদের নিমন্ত্রণ হয় বার্লিনে—বার্লিনে কোনো লেখক নাম করতে পারলে ভিয়েনা য়ুনিভার্সিটি তাঁকে অনারারি ডক্টরেট দেয়।

এই দু' শহরের দুশমনি-বর্জিত আড়াআড়িতেই বিরাট জর্মন সাহিত্য গড়ে উঠেছে, জর্মন সঙ্গীত বলতে এ কথা কেউ শুধায় না মৎসার্ট, স্ট্রাউসের জন্ম কোথায় হয়েছিল এবং একথা সকলেই জানে যে সঙ্গীতসম্রাট বেটোফেনের জন্ম হয় বন্ ( উপস্থিত পশ্চিম জর্মনির রাজধানী ) শহরে এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটান ভিয়েনাতে।

বাঙলা ভূমিতে ফিরে আসি।

বাঙলার বিদগ্ধ সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয় প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গের কলকাতাকে কেন্দ্র করে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ( এমন কি শরৎচন্দ্র পর্যন্ত ), প্রথম চৌধুরী, নজরুল ইসলাম এরা সবাই জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন কলকাতায়। বাঙলা সাহিত্য ( গদ্যসাহিত্য তো বটেই ) রাজধানীর সাহিত্য,—কম্যুনিস্টরা এই সাহিত্যকেই গালাগাল দিয়ে বলেন 'বুর্জোয়া' সাহিত্য—যদিও আমাদের কর্ণে এ গালাগাল বংশীধ্বনির ন্যায় শোনায়।

মাত্র সেদিন পূব-বাঙলার লোক সাহিত্যের আসরে নামলেন। বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, মানিককে কিন্তু বাধ্য হয়ে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়েছে। ঢাকা যে সাহিত্যের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি, তার প্রধান কারণ ঢাকা কখনো কলকাতার মত তামাম ভারত এবং বাঙলার রাজধানী হয়ে উঠতে পারেনি।

আমাদের ভয় হয়েছিল পূর্ববঙ্গ পাছে বাঙলা ভাষা বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করে বসে। সে ভয় কেটে গিয়েছে এবং ঢাকার বাঙলা যে উরদু হরফে লেখা হবে না, সে খবরটা পেয়েও আমরা আশ্বস্ত হয়েছি।

এইবার ঢাকার পালা নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করবার। কলকাতা যে অন্তকার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভের ফলে নবীন উৎসাহ, নবীন উদ্দীপনায় নূতন সাহিত্য গড়তে মন দেবে, সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই এবং কলকাতার অধি-কাংশ সাহিত্যিকই যে পূর্ববঙ্গে আপন পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করেন, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মনে একটু দ্বিধা রয়ে গিয়েছে পূর্ব-বাঙলার ভবিষ্যৎ সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে। কেউ কেউ ভাবছেন পূব-বাঙলা হয়ত এমন সব শব্দ বাক্যবিন্যাস আরবী ফারসী থেকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করবে যে, কালে কলকাতার লোক ঢাকায় প্রকাশিত বাঙলা বই পড়ে বুঝতে পারবে না। তাঁদের এ ভয় দূর করে দেবার জন্যই আজ আমার এ-প্রবন্ধ লেখা—যাতে করে পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বাধীনতা লাভের আনন্দ আজ সর্বপ্রকার দ্বিধাবর্জিত নিরঙ্কুশ হয়।

ইচ্ছে করলেই যে-কোনো ভাষা থেকে জাহাজ-বোঝাই শব্দ গ্রহণ করা যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে আজকের দিনের বাঙলা ভাষাই নিন। এ ভাষা যে শব্দসম্পদে কত দীন, সে কথা যাঁরা অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য নূতন চিন্তা নিয়ে বাঙলায় কারবার করেন তাঁরাই জানেন এবং তাঁদের অধিকাংশই ইংরেজি থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি শব্দ গ্রহণ করতে পারলে বহু মুশকিল, বহু গর্দিশ থেকে বেঁচে যেতেন। কিন্তু উপায় নেই—তাঁরা বিলক্ষণ জানেন, ইংরেজি-অনভিজ্ঞ যে পাঠকের জন্য তাঁরা বই লিখতে যাচ্ছেন, তারাই সে বই বুঝতে পারবে না। তাহলে আর লাভটা কি হল?

পূব-বাঙলায় তার চেয়েও বড় বাধা এই যে, গাদা গাদা আরবী ফারসী শব্দ ঢোকাবার মত উমদা আরবী ফারসী এবং বাঙলা জানেন কয়টি গুণী? ডঃ শহিদুল্লা তো একজন। এবং বঙ্গ বিভাগের পরও তিনি বেধড়ক, বেদরদ আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করেননি। যদি করেনও, বুঝবে ক'টা লোক? এন্তার আরবী ফারসী মেশানো বাঙলা বোঝার মত এলেম পূর্ব-বঙালীর এবং আপনার আমার পেটে তো নেই। আর যদি বলেন ভবিষ্যতে একদিন পূর্ব-বাঙলার জনসাধারণ, চাষাভূষো সব্বাই উত্তম আরবী-ফারসী শিখে যাবে আর হুশ হুশ করে আরবী-ফারসীর বগ-হারে রান্না বাঙলা ভাষা বুঝে ফেলতে পারবে, তাহলে তো সে আনন্দের কথা। প্রত্যেক ব্যক্তি তিনটি ভাষায় (তারও একটা আরবীর মতো কঠিন ভাষা! বিবেচনা করুন) আলিম-ফাজিল, এত বড় ডাঙর সুখস্বপ্ন পূর্ব-বাঙলার নমস্য ব্যক্তিরাও দেখেন না।

আর যদি বলেন, নজরুল ইসলামের মত কোনো শক্তিশালী লেখক এসে সেই কর্মটি করে দেবেন তবে উত্তরে বলি, একদা পশ্চিম-বাঙলাতেই এবং আরবী-ফারসী-অনভিজ্ঞ রসিক সম্প্রদায়ের ভিতরই তাঁর কদর হয়েছিল প্রথম—পূর্ব-বাঙলা তাঁকে আদর করে বহু পরে। আজ যদি ঢাকায় নজরুল ইসলামের মত কবি জন্মান, তবে কলকাতা তাঁর কেতাব আগেরই মত উদ্‌গ্রীব, স্তম্ভিত-নিঃশ্বাস হয়ে পড়বে। তাতে করে তাবৎ বাঙলা সাহিত্যই শক্তিশালী হবে, শুধু পূব-বাঙলার সাহিত্যই না।

তাই এই আনন্দের দিনে নিবেদন করি, রাজনৈতিকরা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। ভারতীয় অন্ততঃ বাঙালী সাহিত্যিক যেন সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের ভিতর দিয়ে সে শান্তি পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেয়।

## 'বাংলা-একাডেমী পত্রিকা'

পূর্ববঙ্গের বাঙলা-একাডেমীর ইতিহাস দিতে গিয়ে একাডেমীর মুখপত্র বলছেন :

"পূর্ব পাকিস্তানে 'ভাষা আন্দোলনে'র সহিত 'বাঙলা-একাডেমী'র ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ১৯৪৮ ইংরেজীর একেবারেই গোড়ার দিকে বাঙলা-ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতিদানের জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ত দাবী দেশের তরুণ ছাত্র-সমাজ হইতে উত্থিত হয়, নানা বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া তাহা দৈনন্দিন প্রবলতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকে। মাত্র চারি বৎসর পার হইতে না হইতেই, ১৯৫২ ইংরেজীতে আসিয়া এই আন্দোলন চরম বেগ সঞ্চয় করে এবং তাহার ফলে এই সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণে ভাষা-আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। এই অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনায় চারিটি ছাত্র নিহত এবং আরো কতিপয় ছাত্র আহত হয়। এই দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা-আন্দোলন ছাত্র-সমাজের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশের সর্বত্র গণআন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।.....আন্দোলনটি অচিরেই সরকারের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। এইভাবে ১৯৫৩ সাল কাটিয়ে গেলে পর, ১৯৫৪ সালে দেশে সাধারণ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য জনাব মৌলানা আব্দুল হামিদ খাঁ ভাসানী সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী-মুসলিম-লীগ যে একুশ দফা কর্মসূচী লইয়া আগাইয়া আসেন, বাঙলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়া 'বর্ধমান হাউসে' একটি 'বাঙলা-একাডেমী' স্থাপনের পরিকল্পনাও ছিল তাহার মধ্যে অন্যতম।.....'নূতন যুক্তফ্রন্ট' সরকারের আমলে ১৯৫৫ ইংরেজীর ৩রা ডিসেম্বর একুশ দফার রূপায়ণরূপে ইহার অন্যতম দফা 'বাঙলা-একাডেমীর' উদ্বোধন কার্য 'বর্ধমান হাউসে' সুসম্পন্ন করা হয়।"

একাডেমীতে থাকবে (অ) গবেষণা বিভাগ : তার দুটি শাখা—(১) বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, (২) পাণ্ডুলিপি তথা লোকগাথা, লোকসঙ্গীত ইত্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ। (আ) অনুবাদ বিভাগ, (ই) সঙ্কলন

ও প্রকাশনা- বিভাগ, (ঈ) সাংস্কৃতিক-বিভাগ—পাঠাগার, সাহিত্য-সভা, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি।

বক্ষ্যমান সংখ্যা 'বাঙলা-একাডেমী'[১] পত্রিকার প্রথম সংখ্যা।

পত্রিকায় ন'টি তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে—মাত্র একটি ছাড়া আর সব কটি প্রবন্ধই একাডেমির সাহিত্যসভায় পড়া হয়েছিল।

প্রথম প্রবন্ধটি উভয় বাঙলায় সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সায়েবের রচনা—এ প্রবন্ধে তিনি 'পণ্ডিত রেয়াজ অল্-দিন আহমদ মাশহাদি' নামক একজন বাঙালী লেখকের 'সমাজ ও সংস্কারক' নামক পুস্তকখানির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তার প্রয়োজনও বিলক্ষণ ছিল, কারণ ১২৯০ সালে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করেন। কেন করেছিলেন সেটা পুস্তকের উদ্ধৃতি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। রেয়াজ অল-দিন রাজনৈতিক নেতা জমাল্উদ্দীন আফগানীর ন্যায় ইংরেজের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার প্রয়াসী ছিলেন। এই প্রচেষ্টা করতে গিয়ে রেয়াজ অল্-দিন হৃদয়ঙ্গম করেন যে একদল হিন্দু যেরকম অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন 'সব-কিছু আমাদের শাস্ত্রেই আছে', 'ইয়োরোপীর জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন কিছু নেই যা আমাদের মুনি-ঋষিরা জানতেন না' ঠিক সেই রকম বেশীর ভাগ মুসলমানই বিশ্বাস করেন যে, আরবীর মাধ্যমে তাঁরা যে আরবী-ইরানী আভিচেন্না আভেরস এবং গ্রীক প্লাতো-আরিস্টট্লের দর্শন-বিজ্ঞান ৮০০। ১০০০ বৎসর পূর্বে আয়ত্ত করেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীতেও সেই যথেষ্ট, নূতন কিছু শেখবার নেই। এ বিতর্কের সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের তেমন কোনো আন্তরিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু রেয়াজ অল্-দিন সেদিন তাঁর পর্যবেক্ষণ, মনোবেদনা ও পথনির্দর্শন যে-ভাষায় প্রকাশ করেছেন সেটি তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও একাধিক ভাষার সঙ্গে তাঁর দৃঢ় যোগসূত্রের পরিচয় দেয়।

"হিজরি দ্বিতীয়াদি শতাব্দীতে মোসলমান পণ্ডিতেরা যে-সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞান-গণিতবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন শাস্ত্রকোবিদগণও সম্পূর্ণরূপে তাহারই অনুবর্তন করেন। বিশেষ যাঁহাদিগের রচনাশক্তি ও কল্পনাশক্তি সমধিক তেজস্বিনী, তাঁহারা সেই কীট নিষ্ঠুষিত প্রাচীনতম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিবৃতি প্রকৃতি লিখিয়া আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনা অনুসারে বর্তমান চিন্তা ও নবাবিষ্কৃত সমস্তই ভ্রমপ্রদায়ে আশ্রয় ও অকিঞ্চিৎকর; কেবল

---

[১] 'একাডেমীর' ইংরিজি উচ্চারণই যখন নেওয়া হয়েছে তখন 'একাডেমী' লিখলেই বোধ হয় ভালো হত; কারণ ইংরেজিতে 'মি' হ্রস্ব।

প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা পৃথিবী এখনও চলিতেছে; অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, লৌহবর্ত্ম, তড়িতবার্তাবহ, তাপমান, বাতমান প্রভৃতি লোকসমাজের আবশ্যক ও বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সত্যাদি সমুদায়ই হিন্দুদিগের বিশ্বকর্মার ন্যায় মুসলমানদের লোকমান-হাকিমের চর্বিত-চর্বণ মাত্র। এ সমস্তকে কল্পতরুরূপী বর্তমান বিজ্ঞান-বৃক্ষের অভিনব বিষ-অমৃত-ফল তাহা মুসলমান অর্ধ শিক্ষিত লোকেরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না, তাঁহারা আরাস্তু (আরিস্টট্‌ল), আফ্‌লাতুন্ (প্লেটো) প্রভৃতির প্রাচীন জীর্ণমত সকল গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া কৃতার্থ হয়েন বটে, কিন্তু আধুনিক নিউটন, গালিলিয়ো, কেপ্‌লার, ডারুইন, লাপ্লাস, কম্‌টির (কঁৎ) অতুল প্রতিভার দিকে তাঁহাদের অনুমাত্রও মনঃসংযোগ নাই। প্রত্যুত একপ্রকার বিদ্বেষ-বুদ্ধি দৃষ্ট হয়। প্রাচীন মোসলমান মহাপণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ ও গ্রীসকে আপনাদের শিক্ষাগুরু বলিয়া জগতে অকুণ্ঠিত চিত্তে, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক অজ্ঞান মোসলমান শিক্ষিত লোকেরা তাদৃশ্য প্রাধান্যের কথা মুখে আনিতেও লজ্জা বিবেচনা করেন। সুতরাং পৃথিবীর জাতি-সাধারণের পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞান ও বুদ্ধির আদানপ্রদানে যে কুশল ও কল্যাণ সম্ভব, মোসলমানেরা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত রহিয়াছেন। কিন্তু যাহা সত্য তাহা নিউটনের সত্য, কোপার্নিকস বা আর্যভট্টের সত্য বা আবু আলি সিনার (আভিচেন্না) সত্য নহে, তাহাতে প্রত্যেক বিশ্ববাসীরই তুল্য অধিকার।"

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি মুসলমানদের ঔদাসীন্য দেখে রেয়াজ অল্‌-দিন যে কতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন এবং কী অকুণ্ঠ ভাষায় তার প্রকাশ দিয়েছিলেন নিম্নে তার উদাহরণ দি ;—

"যাঁহারা এসলাম গ্রহণ পূর্বক মোসলমান নামে বিখ্যাত হয়েন, তাঁহাদের গভীর প্রেম, স্বপ্ন, স্নেহ ও স্বদেশবাৎসল্য সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়, কেবল তৎসমুদায়ের স্থানে এক সামান্যরূপ সাম্প্রদায়িক সহানুভূতির সঞ্চারদৃষ্ট হয়। সুতরাং তাঁহাদের হস্ত সকলের বিরুদ্ধে এবং সকলের হস্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। মাতৃভূমি ও জন্মভূমি ঘটিত ভাষার প্রতি তাঁহাদের মমতাজ্ঞান নাই; প্রত্যুত তৎসমস্ত পরদেশ ও পরভাষা বলিয়া অবিরত উপেক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদের স্বদেশও নিজ ভাষা বলিয়া অপর কোনও পৃথক বস্তু দৃষ্ট হয় না, অথবা তাঁহারা অখিল মোসলমান সমাজ ও ধর্মকে এক ভাষার অধীনে স্থাপন করিতে উদ্যত।"

এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষকে অনায়াসে বাঙালী মুসলমানের রামমোহন বলা

যেতে পারে। কিন্তু হায়, বাঙালী মুসলমান এঁকে তখন চিনতে পারেনি। আজ যদি উভয় বাঙলার মুসলমান এঁকে চিনতে পারে, তবে পূব বাঙলার একাডেমী আমাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য অন্তহীন প্রশংসা অর্জন করবেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে পূব বাঙলার জনপ্রিয় মাসিক 'মাহেনও'-এর সম্পাদক জনাব আবদুল কাদির, কবি মালিক মুহম্মদ জয়সীর 'পদুমাবৎ কাব্যে'র 'অনুবাদক' পূব বাঙলার কবি সৈয়দ আলাওলও তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমাদের নূতন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'পদ্মাবতী'র পুঁথি সংগ্রহ করা অতি কঠিন। লেখক এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতি এতই পাণ্ডিত্য ও রসবোধের সঙ্গে করেছেন যে মূল পড়া না থাকলেও কাব্যখানির সঙ্গে যে পরিচয় হয় তা অকৃত্রিম ও বিকৃতিহীন। তবে লেখক যে আলাওলকে 'নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ কবি' বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। আশা করি কাদির সাহেব এ সম্বন্ধে দীর্ঘতর প্রবন্ধ লিখে আমাদের সন্দেহভঞ্জন করবেন।

অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী মীর মশাররফ হোসেনের কর্মজীবন ও সাহিত্য-চর্চা নিয়ে যে গভীর গবেষণাত্মক প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে 'বিষাদ সিন্ধু'র অনুরাগীদের প্রভূত উপকার হবে সন্দেহ নেই। মশারফ হোসেনকে বাঙালী এক 'বিষাদ-সিন্ধু'র লেখক হিসাবেই চেনে; তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রচুর পরিচয় এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ থেকেই পাওয়া যায়।

সৈয়দ মোর্তাজা আলী সাহেব 'বাঙলা গদ্যের আদিযুগ' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে চারটি উদাহরণ দিয়েছেন। (১) ১৫৫৫ খৃঃ অহমরাজ চুকম্পাকে লেখা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের চিঠি, (২) ১৬৪৭ খৃঃ শ্রীহট্টাঞ্চলে লেখা একটি 'হকীকৎ নামা', (৩) জয়ন্তিয়া বুরুঞ্জী থেকে উদ্ধৃত আসাম রাজকে লেখা জয়ন্তিপুরের রাজার একখানা চিঠি ও (৪) মনোএলদা—আসসুমের কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ থেকে। যে সমস্ত অঞ্চলের ভাষা থেকে তিনি উদাহরণ নিয়েছেন সে-সব অঞ্চলের ঐতিহ্য ও বর্তমানে প্রচলিত উপভাষাগুলির সঙ্গে তিনি সুপরিচিত এবং তাঁর 'হিসটরি অব জয়ন্তিয়া' ঐ ভূখণ্ড সম্বন্ধে ইংরেজিতে লিখিত একমাত্র গ্রন্থ ( পাঠান-মোগল কেউই খাসিয়া পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত 'জয়ন্তিয়া রাজত্ব' অধিকার করতে পারেনি বলে এদেশে প্রাচীন হিন্দু পলিটির প্রচুর আবিষ্কৃত নিদর্শন পাওয়া যায় ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র চর্চাকারীর পক্ষে অপরিত্যাজ্য। অগ্রজের সাহিত্যচর্চার নিরপেক্ষ আলোচনা নন্দনশাস্ত্রসম্মত,

কিন্তু সংস্কার বাধা দেয়।

পাবনার সাধক কবি জহীরউদ্দীনের জীবন ও গীত সম্বন্ধে লিখেছেন মৌলবী গোলাম সাকলায়েন ও শ্রীহট্টের কবি শাহ হুসেন আলম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন মৌলবী নিজামউদ্দীন আহম্মদ।

ইরানের সূফী মতবাদ বাঙলাদেশে এ-দেশের নিজস্ব শ্রীরাধাকেন্দ্রিক বৈষ্ণব ভক্তিবাদের সঙ্গে মিলে যাওয়াতে এইসব মারিফতী (গুহ্য তত্ত্বাত্মক) গীতের সৃষ্টি জর্মনপণ্ডিত গল্‌ড্‌ৎসিহার ও হর্টেনের বিশ্বাস ইরানে থাকাকালীনই সূফী মতবাদ বেদান্ত, যোগ ও নারদ শাণ্ডিল্যের ভক্তিবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল; ফরাসী পণ্ডিত মাসিন্নো অস্বীকার করেন কিন্তু ইরানী এবং আরব কবিদের ন্যায় এঁরা আপন জীবনকাহিনী তাঁদের সৃষ্টির ভিতর বুনে দিতেন না। আত্মগোপন করার ভারতীয় ঐতিহ্যই বরঞ্চ তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন (কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, 'চণ্ডীদাস কয়' জাতীয় ভণিতা মুসলমানদের কাছ থেকে নেওয়া)। দুই প্রবন্ধের লেখকই যেটুকু খবর পাওয়া যায় তাই নিঙড়ে নিঙড়ে তাঁদের কাব্যসৃষ্টি থেকে বের করেছেন। এই ধরনের কাজের প্রতি একাডেমী যে বিশেষ মনোযোগ দেবেন সে-কথা পূর্বেই বলেছি। ভালোই, কারণ পশ্চিমবঙ্গের লেখকেরা যথেষ্ট আরবী-ফার্সী জানেন না বলে মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের আরবী-ফার্সী-ভর্তি অংশগুলোর টীকাটিপ্পনী কর্মটি পর্যন্ত এড়িয়ে যান—এ-কাজ বিশেষ করে পূব বাঙলাতেই ভালো হবে।

চৌধুরী শামসুর রহমান সায়েবের 'আমাদের সাংবাদিক প্রচেষ্টা' তথ্যবহুল প্রবন্ধ—অশেষ পরিশ্রমের পরিপূর্ণ সাফল্য।

'মধুরেন সমাপয়েৎ' করেছেন একাডেমীর সুযোগ্য সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্ মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি 'রহীমুন্‌নিসা' প্রবন্ধ দিয়ে। ১৭৬৩—১৮০০-র মধ্যবর্তী কালের এই মহিলা কবি সরস স্বাভাবিক বাঙলায় যে কাব্যসৃষ্টি করে গিয়েছেন তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন হক্ সাহেব—ভবিষ্যতে আরো হবে সে আশা রাখি। উপস্থিত দু' একটি উদাহরণ পেশ করছি। স্বামীর আদেশে তিনি সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' নকল করে দেন; সেই সম্পর্কে বলেন—

'শুন গুণিগণ হই এক মন
লেখিকার নিবেদন।

অক্ষর পড়িলে টুটাপদ হৈলে
শুধরিতা সর্বজন ॥
পদ এই রাষ্ট্র হেন মহাকষ্ট
পুঁথি সতী পদ্মাবতী।
আলাওল মণি বুদ্ধি বলে গুণী
বিরচিল এ ভারতী ॥
পদের উকতি বুঝি কি শকতি
মুই হীন তিরী জাতি।
স্বামীর আদেশ মানিয়া বিশেষ
সাহস করিনু গাঁথি ॥'

রহীমুন্নিসার পিতামহ ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে অজ্ঞাতবাস বরণ করেন :—

অগ্রগামী হৈয়া ইংরাজ যুদ্ধ দিল।
দৈবদশা ফিরিঙ্গীর বিজয় হইল ॥
মুখ্য মুখ্য সবের বহুল রত্নধন।
লুটিয়া করিল খয় যত পাপিগণ ॥

পিতামহের মাতৃভাষা নিশ্চয়ই হয় ফার্সী নয়, উর্দু ছিল। রহীমুন্নিসা কিন্তু খাঁটি বাঙালী। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লিখি এ-ভারতী।
রহিমন্নিচা নাম জান, আদৌ ছিরীমতী ॥

অর্থাৎ তাঁর নাম 'শ্রীমতী রহিমুন্নিসা'।

শোকের কবিতায় এ মহিলার অসাধারণ সরল কবিত্বরস প্রকাশ পেয়েছে। সামান্য উদাহরণ দিয়েও ভবিষ্যতে এর 'ভারতী' আরো প্রকাশিত হবে এই আশা নিয়ে এ আলোচনা শেষ করি ;—

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বারে বার।
মোর জাদু কাল ফিরি না আসিল আর ॥
আশ্বিনেতে খোয়াময় কান্দে তরুলতাচর,
'ভাই' বলি কান্দি উভরায়।
আমার কান্দন শুনি বনে কান্দে কুরঙ্গিনী
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায় ॥

একাডেমীর ভার যোগ্য স্কন্ধে পড়েছে, এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

একাডেমীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো না। বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হলে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ফ্যারাডেকে নাকি এক মহিলা এই প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি নাকি গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, "ম্যাডাম্, নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ কি কে বলতে পারে!"

উপস্থিত দেখতে পারছি শিশুটি বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত ও তার কৌতূহল অসীম। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলি, "শতং জীব, সহস্রং জীব।"

## রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ

( বগুড়া কলেজের সাহিত্য-অধিবেশনের সভাপতিরূপে অভিভাষণ )

পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা এবং সমস্ত ধর্মমত ভৌগোলিক কারণে অল্পপরিসর নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের সভ্যতা এবং ধর্মমত গড়ে তুলেছে। কিন্তু যখনই সেই সভ্যতা এবং ধর্মমত নিজের গতি মুক্ত হয়ে বাইরে অন্যের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছে তখনি তাদের মধ্যে দেশকাল পাত্রভেদে একটু পরিবর্তন হয়েছে। আমার আজকের বক্তব্য ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে আপনাদের আমার আগের কথাটা একটু চিন্তা করতে বলি। আমি নিজে মুসলমান, কাজেই এ বিষয়ে আমার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকা ছাড়া আমি নানা দেশ ঘুরে এবং এ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানসঞ্চয় করে আমার নিজস্ব চিন্তাধারা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি।

আজ বিজ্ঞানের কৃপায় দেশে-দেশের ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচেছে, কাজেই এক দেশ আর এক দেশকে এক সভ্যতা আর এক সভ্যতাকে নিবিড় করে জানবার সুযোগ পাচ্ছে। এই আধুনিক যুগে সত্যিকারের ইসলামের সেবককে মানসিক জড়ত্ব ত্যাগ করে ইসলামের সঙ্গে অন্য প্রচলিত সব ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে তার আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে—শুধু মৌলভী-মোল্লার অনুশাসন এবং ধর্মব্যাখ্যানের উপর নির্ভর করলে চলবে না।

ইসলাম সম্বন্ধে আপনাদের বোধ হয় একটা ধারণা আছে যে 'ইহাই একমাত্র ভগবান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট একমাত্র সত্যধর্ম'। কিন্তু সেটা সত্যি নয়—কেননা

এর আগেও মুশা ও যীশুখৃষ্টের নিকট ভগবানের প্রত্যাদেশ সত্যধর্মরূপে প্রকাশ হয়েছিল। এক বিষয়ে ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের সাদৃশ্য আছে—আল্লা যুগে যুগে সত্যপুরুষ বা প্রফেটের মাধ্যমে সত্যবাণী প্রকাশ করেন, কাজেই ইসলামকে একেবারে আকস্মিক বলে ধরলে চল্‌বে না—পূর্বোক্ত দুই ধর্মমতের পরিণতি হিসাবেই জানতে হবে এবং কোরানও এ সম্বন্ধে এই এক কথাই বলেন।

নতুন কোন ধর্মপ্রচারের পশ্চাতে শুধু ধর্মের মহান বাণী ব্যতীত একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি না থাকলে তার প্রতিষ্ঠা হওয়া শক্ত। যীশুখৃষ্ট সুদখোর ইহুদী বণিক-সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মস্থানকে টাকার লেনদেনের স্থান দেখে তার প্রতিবাদ করেছিলেন—ধনীশোষিত জনসাধারণ তাঁকে সমর্থন করলেও স্বার্থ-হানিভীত ধনী ইহুদীরা তাঁকে রাজদ্রোহী হিসাবে অভিযুক্ত করে তার প্রাণহানি করিয়েছিলেন। হজরত মহম্মদের নতুন ধর্ম ইসলামের প্রচারের পশ্চাতেও এই প্রকার একটা আর্থিক প্রোগ্রাম ছিল—কিনা ধনীদের আয়ের কিয়দংশ 'জাকাত' অর্থাৎ গরীবদের দান করতে হবে। এতে 'হ্যাভ-নট'রা আশ্বস্ত হ'লেও 'হ্যাভে'র দল আশঙ্কিত হয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করল। একেশ্বরবাদ প্রচারে যারা বিশেষ বিচলিত হয়নি সেই কোরেশ সম্প্রদায় তাকে মক্কা-ছাড়া করলো। কাজেই ইসলামের এই সাম্যের ভিত্তিতে ধনবণ্টন-নীতি যদি পালন না করা হয়—redistribution of weath দ্বারা যদি 'হ্যাভ-নট'দের কোন সুব্যবস্থা না হয়, তাহা হলে ইসলামের মূলনীতি মানা হবে না। সবাইকে—ধনী-দরিদ্রকে সঙ্গে নিয়ে শুধু একসঙ্গে আহার এবং বাসের সুবিধা দিলেই Islamic democracy প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইসলামের যে অর্থ নৈতিক প্রোগ্রাম আছে তাকেও কার্যকরী করে তোলবার জন্য প্রয়াস করতে হবে।

হজরত মহম্মদ যখন মদিনা থেকে আবার মক্কায় ফিরে এলেন তখন মক্কাবাসীরা তাঁর ধর্মকে সাদরে গ্রহণ করলো—কোনো রক্তপাতের দরকার হয়নি। সেটা শুধু তাঁর মহাপুরুষত্বের জন্য, না তিনি 'হ্যাভনট'দের সহানুভূতি পেয়েছিলেন বলে? তারপর খলিফাদের আমলে পারস্যসাম্রাজ্য জয়ে ইসলামের এই অর্থবণ্টননীতি কার্যকরী হয়েছিল—পারস্যের জনগণ করভারে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল এবং যখনই ইসলামের অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের কথা ছড়িয়ে পড়লো তাদের মধ্যে তখনই তারা ইসলামকে সাদরে বরণ করে নিলো—নইলে যে বিরাট পারস্যবাহিনী গ্রীকদের পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছিল তারা কেন ইসলামের কাছে পরাস্ত হবে! ইসলামের

ধনসাম্যের Message বা বাণী তাদের জনগণের Morale একেবারে নষ্ট করে দিয়েছিল। এই ইসলামের বাণীই তুরস্ক, মিশর, উত্তর আফ্রিকা স্পেন জয়ে সাহায্য করেছে—সুদ্ধ অস্ত্রবল এবং নতুন ধর্মের বাণীতে হয়নি। ইসলামের আদিযুগের কাহিনী হচ্ছে এই।

তারপর যখন ইসলামের ক্ষমতা বিস্তৃত হোল—দেশজয়ে যখন সম্পদে ইসলাম সাম্রাজ্য-সমৃদ্ধ হতে লাগল, তখন থেকে তাঁরা হ্যাভনটদের কথা বিস্মৃত হতে লাগল এবং ইসলামের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পতন আরম্ভ হল। ভারতে যখন মুসলমান এলো তখন ইসলামের সেই Message আর নেই। কাজেই দেখি নবাব ওমরাহদের বংশধর ব্যতীত মধ্যভারতের কয়েকটি শহর অঞ্চল ছাড়া ইসলাম আর কোথায়ও প্রতিষ্ঠিত হলো না। বাংলায়ও মুসলমান ধর্মের প্রসার হোত না যদি আরব থেকে প্রচারকরা ইসলামের মূল নীতির বাহক ও ধারক হয়ে এখানে প্রচারে অবতীর্ণ না হতেন।

এদিকে ভারতে ঢুকেও ইসলাম নিজের ধর্মমত সম্বন্ধে একপেশে হয়ে রইল। কারণ হিন্দুধর্মের ভগবান-সম্পর্কিত দিকটা বড় উদার—তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে যাকে খুশী যখন মেনে নিলেই হোল—তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু খাওয়া-ছোঁওয়া-বিবাহাদি ব্যাপারে সামাজিক অনুশাসন বেশ কড়া—বিশেষ বিশেষ পন্থী এবং নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে—সে সব অমান্য করলেই জাত গেলো। মুসলমানদের এ বিষয়ে ঠিক হিন্দুদের বিপরীত—ভগবান 'একমেবা-দ্বিতীয়ম' এটা মানতেই হবে এবং এ সম্বন্ধে কোন ভিন্নমত পোষণ করা একেবারেই চলবে না। আর সামাজিক ব্যাপারে অর্থাৎ আহারবিহারে একেবারে উদার। কাজেই হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোন Common Platform বা আপোস-ক্ষেত্র পাওয়া গেল না, কাজেই মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে সাত-আটশ বছর বাস করলেও হিন্দুর বিরাট দর্শনশাস্ত্র ইসলামে কোন ছায়াপাত করতে পারলো না।

এইভাবে হিন্দু এবং মুসলমান টোল এবং মাদ্রাসাতে মশগুল হয়ে রইল। ধর্মমতের মিল আর হয়ে উঠলো না। কেউ কাউকে জানার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করলো না। ইংরাজ এসে কিন্তু 'মিরাকেল' ঘটালো—টোল মাদ্রাসা ছেড়ে হিন্দু-মুসলমান এক বিদ্যায়তনে পড়াশুনা করতে লাগল—১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী পারসীর জায়গায় রাষ্ট্রভাষা হওয়াতে মুসলমান কিছুকাল মুখ ফিরিয়ে অভিমান করে বসেছিল—হিন্দুরা আগেই এসেছে বলে শিক্ষায় মুসলমানরা একটু পেছিয়ে গেলো। কিন্তু আজকের দিনে রাষ্ট্র দুটো হলেও দু'রাষ্ট্রের মধ্যেই সকল ধর্মের লোক আছে,

কিন্তু তাতে শিক্ষার বা কালচারের অসুবিধা কেন হবে। হিন্দু-মুসলমানে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গীর একটা ঐক্য থাকতে পারে—সেখানে ধর্মের কোন স্থান নেই। পারস্যের কালচার যেমন পারস্য ভাষার সাহায্যে নতুন করে গড়ে উঠেছে—যদিও পারসী ভাষা আরবী অর্থাৎ পবিত্র কোরাণের ভাষা নয়—একেবারে কাফেরের ভাষা। পারসী ভাষায় রুমি, জালালুদ্দিন, সাদি হাফিজ সার্থক সাহিত্যের সৃষ্টি করলো। ভারতের উর্দুভাষা কিন্তু আরবী-পারসী-হিন্দী মন্থন করে গড়ে ওঠেনি—উর্দুর বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে তো ঢের হিন্দু রয়েছে। উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের বহু মন্দিরের গঠনশিল্প কি হিন্দু ও ইসলামের মিলিত কালচারের চিহ্ন বহন করছে না? গজনীর সুলতান মামুদের সভাকবি আলবেরুনী এদেশে দীর্ঘকাল বাস করেছেন শুধু এদেশের সভ্যতাকে জানবার জন্য এবং সেটার যেটুকু ভাল সেটুকু আহরণ করে নিজের দেশের সভ্যতার অঙ্গবৃদ্ধি করার জন্য। এই যে Power of assimilation বা পরের ভালটুকু আত্মস্থ করে নেওয়ার ক্ষমতা সেটা একদিন ইসলামের ছিল—সেক্ষেত্রে সে ধর্ম নিরপেক্ষভাবেই চলেছিল।

আজ পূর্ব-পাকিস্তানের এই বিরাট জনসংখ্যাকে ইসলামের ঐতিহ্য মনে রাখতে হবে এবং সেই পরমতসহিষ্ণুতাকে সম্বল করে নিজের ধর্মমতকে আর একটু পরের সমালোচনার দ্বারা সহনশীল এবং তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র করে অগ্রসর হতে হবে—তাহলে জনসংখ্যায় এবং আয়তনে পারস্যাপেক্ষা বড় এই যে পূর্ব বাংলা এ কি উন্নত হতে পারবে না! শুধু ধর্মের ঝুলির উপর নিজস্ব বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে একটা নতুন দেশের পত্তন করা যায় না। নতুন রাষ্ট্রকে নতুন রূপে দেখতে হলে ইসলাম ধর্ম ভাল করে জানতে হবে—পড়তে হবে ইসলামের মূলনীতিগুলো যা সর্বদেশের এবং সর্বকালের জন্য। তা হলেই দেশস্বাধীন সত্যিকারের হবে। প্রাক-স্বাধীন যুগে ছিল ভাঙার কাজ—স্বাধীনোত্তর সময়ে হবে গড়ার কাজ। ভারত ডোমিনিয়নের কটা বন্দুক-কামান আছে এবং আমাদেরই বা কটা আছে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দেশের কোন উপকার হবে না। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা নয়—নিজের দেশের কিসে ভাল হবে, দেশের লোক কিসে পেটভরে খেতে এবং পরতে পারবে সেই সব শুভঙ্করী বুদ্ধিবৃত্তির দিকে আপনাদের উৎসাহ প্রয়োগ করতে হবে। যদি এই কথা মনে রাখেন, দেশের সেবাই আপনাদের উদ্দেশ্য, তাহলে পাতঞ্জলের ভাষায় সেটাই হবে আপনাদের রাষ্ট্রের 'দৃঢ়ভিত্তি'—তার উপর প্রতিষ্ঠিত হলে এর আর অধঃপতন নেই।

# বৈদেশিকী

ইংরাজ রাজত্বে আমাদের মস্ত সুবিধা এই ছিল যে দেশ-বিদেশের খবর রাখার আমাদের কোনো দায় ছিল না। জর্মনীর সঙ্গে লড়াই করার প্রয়োজন বোধ করলে ইংরেজ যে শুধু আমাদের জিজ্ঞাসা না করেই যুদ্ধ বাধাতো তা নয়, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে হতভাগা দেশকেও সে তার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলত। কোনো সরল ইংরেজ যদি তখন শুধাত যে ভারতবাসীর এ যুদ্ধে সায় আছে কি না, তখন লণ্ডনের বড়কর্তারা অভিমানভরে বলতেন, "এ বড় তাজ্জব প্রশ্ন! এ প্রশ্নে লুকানো রয়েছে আমাদের প্রতি অন্যায় সন্দেহ। খবর নাও, দেখতে পাবে ভারতবর্ষে আমরা কস্মিনকালেও জবরদস্তি-রঙ্‌রুট ( কন্‌স্‌ক্রিপশন ) করিনি। ভারতের প্রত্যেকটি সেপাই আপন খুশ্‌-এক্তেয়ারে জর্মনীর বিরুদ্ধে লড়ছে।"

কাজেই এ রকম উত্তরে শুনে ভূ-ভারত ভাবতো, ভারতীয় সৈন্য অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শবাদী বীরপুরুষ। তাঁরা যে উচ্চ শিক্ষিত সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ? তাঁরা নিশ্চয়ই হিটলারের 'মাইন কাম্‌ফ্‌', রজেনবের্গের 'মিথ্‌' পড়েছেন, কন্‌সান্‌ট্রেশন ক্যাম্প সম্বন্ধে তাঁরা ওকীব-হাল, নাৎসিদলের বর্বরতা সম্বন্ধে তাঁরা বিলক্ষণ সচেতন এবং তাই তাঁরা পৃথিবীতে সত্যসুন্দরমঙ্গল সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জর্মনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন।

তাই যদি হত তা হলে আমাদিগকে মেহন্নত করে এই 'বৈদেশিক পর্যায়' আরম্ভ করতে হত না। আমরা জানি, ভারতবাসী আপন বিরাট দেশ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, এমন কি তার জাতীয় সঙ্গীতে যে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়ের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধেও তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

কাউকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। পরাধীনতার সব চেয়ে মারাত্মক অভিসম্পাত সপ্রকাশ হয় তার 'শিক্ষা'-পদ্ধতিতে। আমরা এতদিন ধরে যে শিক্ষালাভ করেছি তার প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আমরা দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় করে পৃথিবীতে আপন আসন বেছে নি। আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত জড়ভরত করে রাখার; তাতে ইংরেজের লাভ ছিল।

তাই আশ্চর্য বোধ হয় যখন বাঙালীর ছেলে দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে। আনন্দ বোধ হয় যে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দুঃখ-দৈন্যের ভিতরও তারা

তাদের মনের জানালা ক'খানা বন্ধ করে দেয় নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে তুলব না ;—দেশ-বিদেশ ভ্রমণকারী বান্ধবদের মুখে শুনেছি যে, তাঁরা বিদেশে কি শিক্ষা পেয়েছেন, সে সম্বন্ধে বাঙালী তরুণের যত না অনুসন্ধিৎসু তার চেয়ে অনেক বেশী তাদের কৌতূহল যে-দেশ তাঁরা ভ্রমণ করে এসেছেন সে-দেশের নানা খবরাখবর শুনতে। বই পড়াতেও তাদের উৎসাহ কম নয়, আর খবরের কাগজ তো তারা পড়েই।

কিন্তু খবরের কাগজে তারা বিদেশী খবরের সন্ধান পায় কতটুকু ?

আমি বাঙালী দৈনিক কাগজগুলির কথা ভাবছি। সেগুলিতে বিদেশী খবর যেটুকু পরিবেশন করা হয় সে এতই নগণ্য যে তার উপর নির্ভর করে যদি কোনো বাঙালী 'সাধারণ জ্ঞানের' পরীক্ষায় বসে, তবে তার 'অনার্স' বা সসম্মান ফেল অনিবার্য। বাঙলা দৈনিক পড়ে মনে হয়, বিদেশী খবর দেবার বরাত যেন ইংরেজি কাগজের, আবার 'দেশী' ইংরেজি কাগজ পড়লে মনে হয় তাঁরা যেন বরাত চাপিয়ে দিচ্ছেন 'স্টেটসম্যানের' ঘাড়ে। 'বিদেশী খবর ?' ওগুলো দেবে বিদেশী কাগজ—ওসব হচ্ছে 'স্টেটসম্যানের' কর্ম। যেন বাঙালী কাগজ বাঙালী বিধবার সামিল। বিলিতি বেগুনের মত বিলিতী খবর তার পক্ষে নিষিদ্ধ!

আর বিদেশী খবর যে-হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় দেন সেও আবার সর্বপ্রকার টীকা-টিপ্পনী বিবর্জিত। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সের মতও সুশিক্ষিত দেশের কাগজওলারা পর্যন্ত খবর রাখে যে সাধারণ পাঠক কতটুকু জানে না-জানে এবং সেই হিসেবে বিদেশী খবর পরিবেষণ করার সময় প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী দিতে কসুর করে না। শুধু তাই নয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে সে সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা হয়, রবিবারের কাগজে তার বিস্তৃত সচিত্র বিবরণ বেরোয় এবং যদি সমস্ত ব্যাপারটা দেশের সাধারণ লোকের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তবে রাজনৈতিক কর্তাদের আসরে নেবে আপন আপন বক্তব্য খোলসা করে বলতে হয়। শেষ পর্যন্ত হয়ত প্রধান মন্ত্রীকেই বিবৃতি দিতে হয়। দেশের লোকেরা তখন অন্ততঃ এইটুকু প্রত্যয় রাখে যে তাঁর বিবৃতি বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর তৈরী করা হয়েছে। সে-বিশেষজ্ঞ রাজদূত ; যে-দেশ নিয়ে আন্দোলন আলোড়ন চলছে তিনি সে দেশে বসবাস করেন ও প্রতিদিন না হোক প্রতি সপ্তাহে সে-দেশ সম্বন্ধে একখানা গোপনীয় রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পাঠান।

আমাদের পত্রিকাওলারা কোনো রকম মেহন্নত করতে নারাজ। পাঠক কি খবর চায় না-চায়, তাকে কি করে পৃথিবীর খবর সম্বন্ধে উৎসুক করে তোলা যায়,

সে সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। বায়স্কোপওলারা যদি যথেষ্ট বিজ্ঞাপন দেয়, বড় বড় কোম্পানীর নেকনজর থেকে যদি তাঁরা বঞ্চিত না হন তবে কাগজ চলবেই—কেউ ঠেকাতে পারবে না। ভালো খবর পরিবেষণ করার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় একমাত্র নবজাত কাগজের মধ্যে। বাচ্চা হরিণের মত তাঁরা ছুটোছুটি করেন ভালো খবরের সন্ধানে কিন্তু কাগজ চালু হয়ে যাওয়ার পর তাঁরাও মেদস্ফীত হরিণের ন্যায় পাঁচতলা-গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকাটাই জীবনের চরম মোক্ষ বলে ধরে নেন।

বক্ষ্যমান মাসিক এ-সমস্ত অভাব ঘুচিয়ে দেবার স্পর্ধা বা দম্ভ করে না। তার যদি কোনো দম্ভ থাকে তবে সেটুকু মাত্র এই যে সে চেষ্টায় কসুর করবে না। এবং তার ভরসা যে একদিন যোগ্য পাত্র এসে আমাদের আরব্ধ কর্ম সুসম্পন্ন করে দেবেন।

দেশের অত্যন্ত কাছে, যে-দেশকে বিদেশ বলা প্রায় ভুল, সেই দেশ নিয়ে আমাদের এ পর্যায় আরম্ভ হল।

## আফগানী দাবী

একদা এক কান্দাহারী রাজকুমারী বহুশত যোজন অতিক্রম করে বরের সন্ধানে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় কবি তখন ভূ-ভারত দাবড়ে বেড়াচ্ছিলেন—রাজকন্যার দিকে ভালো করে এক নজর তাকিয়ে বল্লেন, 'এ কন্যার নিদেনপক্ষে একশ বাচ্চা হবেই হবে।' একশ বাচ্চা শুনে যেন আমরা আশ্চর্য না হই; কান্দাহারী পাঠান কুমারীর দৈর্ঘ্যপ্রস্থ দেখলে এরকম ভবিষ্যৎবাণী সবাই করে থাকে—গান্ধারীকে দেখে হস্তিনাপুরের ব্যাস যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল সেটা ফলেছিল তো বটেই, এমন কি ছেলেগুলো ঠ্যাঙাবার জন্য একটা বোনও পেয়ে গিয়েছিল।

এ হল প্রায় চার হাজার বৎসরের কথা। কিন্তু আফগানিস্থান পাহাড়ী মুল্লুক, আইনকানুন জানে না, দলিল-দস্তাবেজের ধার ধারে না। সেদেশে কোনো দাবীদাওয়ার মেয়াদ ফুরোয় না, কোনো পাওনা তামাদি হয় না—'টাইমবার' নামক বাঁধাবাঁধি আফগান ঐতিহ্যে কখনো ঠাঁই পাইনি। তাই আজ চার হাজার বৎসর পর আফগানিস্থান তার কান্দাহারী মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসেবে পাকিস্তানের সীমান্ত-প্রদেশ চেয়ে বসেছে।

এ খবর শুনতে পেয়ে পাকিস্তানীরা ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়েছেন। ডমিনিয়নবাসীরা

বক্রহাসি হেসে বলছেন, 'করো পাকিস্তান, হও আলাদা। এইবারে ঠ্যালাটা সামলাও। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে হুঙ্কার দিতে না এককালে ?—এইবার তাগড়া তাগড়া পাঠানদের সঙ্গে লড়ে বাঁচাও 'আপন জান্ আপন পাকিস্তান'।'

পাকিস্তানীদের মনে আবছা-আবছা ধারণা, আফগানিস্থানের ভাষা পশতু, আফগানরা জাতে পাঠান ; উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বাসিন্দারাও পশতু বলে, তারাও জাতে পাঠান। অতএব আফগানিস্থানের দাবীটা হয়ত সম্পূর্ণ কাবুলী পাওনাদারের লাঠির জবরদস্তির ভয় দেখানো নয়।

এ-ধারণা ভুল ইতিহাস পড়ার ফল।

আর্য অভিযান থেকে আরম্ভ করি। আর্যরা এদেশে এসেছিলেন আফগানিস্থান হয়ে। আজ যাঁরা আফগান-পাঠান নামে পরিচিত তাঁরা আমাদেরই এক অংশ। পশতু ভাষা আর্য ভাষা।

আফগানিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় আমাদের মহাভারত পুরাণে—আফগানিস্থানের নিজস্ব কোনা দলিল-দস্তাবেজ নেই। বল্‌হিক দেশ ( ফারসী বল্‌খ্ ), কাম্বোজ, বক্ষু নদী ( Oxus = গ্রীক অক্ষুস্ ) বিধেতি পার্বত্যভূমি আজ 'আফগানিস্থান' নামে পরিচিত। আমাদের ইতিহাসে এসব অঞ্চলকে ভারতবর্ষের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আজও কাবুলীওলারা যে জাফরাণ ও হিঙ 'বল্‌খ্' অঞ্চল থেকে এ দেশে নিয়ে আসে তার নাম সংস্কৃতে 'বাল্‌হিকম্'।

পাকাপাকি ইতিহাস আরম্ভ হয় সিকন্দর সাহের বিজয়-অভিযানের পর থেকে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বল্‌খ্ বাদ সমস্ত আফগানিস্থান গ্রীকদের কাছে কিনে নেন।

রাজা অশোক বৌদ্ধশ্রমণ মাধ্যন্তিককে পাঠান আফগানিস্থানে। আফগানরা অগ্নি-উপাসনা ( সে উপাসনাও বৈদিকধর্মের অংশবিশেষ ও জরথুস্ত্রী ধর্ম নামে পরিচিত ) ছেড়ে দিয়ে খাস ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। আফগানিস্থানের পর্বতগাত্রে খোদিত বামিয়ানের বিরাট বৌদ্ধমূর্তিযুগল ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন। গান্ধার শিল্পের যে-ভাণ্ডার আফগানিস্থানে পাওয়া গিয়াছে তাও ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পকলার সম্মেলনে তৈরী। এসব শিল্পকলাতে আফগানরা কোন অংশ নেয় নি।

মৌর্য পতনের পর গ্রীকরা আফগানিস্থানে রাজত্ব করে। তারাও যে কতদূর ভারতীয় প্রভাবে পড়েছিল সেটা সপ্রমাণ হয় তাদের মুদ্রালাঞ্ছন থেকে। তাতে রয়েছে গ্রীক ও ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি—পশতুর কোনো সন্ধান নেই।

কনিষ্ক ভারত-আফগানিস্থানের রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল

পেশোয়ারে—কাবুলে নয়।

গুপ্তরা আফগানিস্থান দখল করেন নি। কিন্তু গুপ্তযুগের পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্ম আফগানিস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ধর্ষ পাঠানের পক্ষে তথাগতের অহিংসানীতি পালন করা যে সুকঠিন হয়ে উঠেছিল সে-তত্ত্বটা সহজেই অনুমান করতে পারি।

সপ্তম শতাব্দীর চীনা পর্যটক হিউ এন সাঙ কাবুলে এসে দেখেন আফগানিস্থানবাসীদের অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক বৌদ্ধ। তিনি কান্দাহার, গজনী, কাবুল অঞ্চলকে ভারতবর্ষের অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন।

পাঠক যেন মনে না করেন যে ভারতবর্ষ যে-সব যুগে আফগানিস্থানে রাজত্ব করে নি সে-সব যুগে আফগানরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে। আফগানরা লড়াই করতে জানে, কিন্তু শান্তি-স্থাপনার কর্ম অনেক কঠিন—আফগানের পেটে সে বিদ্যে নেই। আর শান্তি স্থাপন না করে রাজত্ব করা যায় কি প্রকারে?

তারপর আফগানিস্থান ও পশ্চিম ভারতবর্ষ মুসলমান হয়ে গেল। পাঠান রাজারা আফগানিস্থানে রাজত্ব করেন নি সত্য কিন্তু দিল্লী ফারসী সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠল। কাবুলীরা শিক্ষাদীক্ষা অর্থাগমের জন্য ভারতবর্ষে আসতে লাগল। আলাউদ্দীন খিলজির সভাকবি আমির খুসরো ফার্সীতে যে 'ইশকিয়া' নামক কাব্য লিখেছেন তাতে 'দেবল-দেবী'র প্রেমের কাহিনী বর্ণিত আছে। কত শত বৎসর হতে চলল আজো কাবুল শহরে জনপ্রিয় কবি ভারতীয় আমির খুসরো। কোন আফগান কবির নাম তো কেউ কখনো এদেশে শোনে নি।

বাবুর আফগান নন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি কান্দাহার, গজনী, কাবুলকে ভারতবর্ষের অংশ হিসাবে ধরেছেন ও এসব জায়গার প্রতি তার যতই দরদ থাকুক না কেন তিনি রাজধানী বসিয়েছিলেন দিল্লীতে। তাঁর দৌহিত্র জলালউদ্দীন আকবর জলালাবাদ শহরের নূতন ভিত্তি নির্মাণ করে শহরকে আপন নাম দিলেন। তাঁর দৌহিত্র শাহজাহান কাবুলে বাবুরের কবরের কাছে যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তামাম কাবুল শহরে সেই একমাত্র দ্রষ্টব্য স্থপতি। (বাবুর কান্দাহার, গজনী, কাবুল অঞ্চলকে তাঁর আত্মজীবনীতে ভারতের অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন)।

কিন্তু এসব তথ্যের চেয়ে বড় তত্ত্বকথা এই যে আফগানরা এককালে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ভারতীয় শিল্পকলা গ্রহণ করেছিল; পাঠান-মুঘল যুগে দিল্লীতে এসে আরবী-ফার্সী শিখত। ১৭৪৭ সালে আহমদ শাহ দুররাণী কর্তৃক আফগানিস্থানে স্বাধীন রাজত্ব (আফগানিস্থানের ইতিহাসে এই প্রথম স্বাধীন

আফগান রাজ্য ) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও, এবং আজ পর্যন্ত আফগানরা আরবী-ফারসী এবং ধর্ম শিক্ষার জন্য আসে ভারতবর্ষের দেওবন্দ-রামপুরে। তারা পারস্যে যায় না, কারণ পারস্যবাসীরা শীয়া। শিক্ষাদীক্ষায় আফগানিস্থান যে ভারতবর্ষের কাছে কি পরিমাণ ঋণী তার সামান্যতম উদাহরণ এই যে, ভারতবর্ষের কোথাও ফার্সী মাতৃভাষারূপে প্রচলিত নয়, কাবুলবাসীদের মাতৃভাষা ফার্সী এবং কাবুলীরা আসে ফার্সী শিখতে ভারতবর্ষে। দেওবন্দ-রামপুরে ফার্সী শেখাবার জন্য যে-রকম বিদ্যালয় আছে, আফগানিস্থানের কোথাও সেরকম নেই।

শুধু ইসলাম শাস্ত্র চর্চার জন্য যে আফগান এ-দেশে আসে তা নয়, বিস্তর ভারতীয় অধ্যাপক, শিক্ষক কাবুল-জালালাবাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষাদান করেছেন। আজ যদি এঁরা সব চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন তবে আফগানিস্থানের 'ওজারত-ই-ম' আরিফ ( শিক্ষা দফতর ) চোখে নরগিস্ ফুল দেখবেন! পক্ষান্তরে আজ যদি সব কাবলীওলা এ-দেশ থেকে চলে যায় তবে বহু কলের মজুর মৌলা আলীতে শিরনি চড়াবে।

এ-সব তো হল প্রাচীন অর্বাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের কথা। তার সব দলিল যে সবাই মেনে নেবেন সে আশা দুরাশা। কারণ শিক্ষা-দীক্ষার জগতে আজকের দিনে সব চেয়ে বড় 'কালোবাজার' চলছে ইতিহাস-পট্টিতে। হিটলার থেকে আরম্ভ করে ট্রুম্যান পর্যন্ত সে বাজারে এক্স-দিল্ দামের সাত ডবল দাম চায়! সাদা বাজারের সসেজ-থেকো ভুঁড়িওলা জর্মন সেখানে 'নর্ভিক-হীরো', ট্রুম্যান-পট্টিতে সুদখোর ইহুদি প্রিয়দর্শী অশোকের ন্যায় ( প্যালেস্টাইনে ) ধর্মপ্রচারাকাঙ্ক্ষী শ্রমণ!

কাজেই বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা হোক্। আফগানদের যুক্তি যদি ভাষা ও জাতীয়তার (racial) ঐক্যের উপর খাড়া হয় তবে আফগানিস্থানের, —প্রথম কর্তব্য হবে আফগানিস্থানের উত্তরাঞ্চল রুশিয়াকে (অর্থাৎ উজবেগিস্থান তুর্কিস্থান ) ছেড়ে দেওয়া; কারণ এ অঞ্চলের লোক জাতে এবং ভাষায় তুর্কোমান, মঙ্গল, উজবেগ।

দ্বিতীয় কর্তব্য হবে আফগানিস্থানের পশ্চিমাঞ্চল ইরানকে ছেড়ে দেওয়া; কারণ এ অঞ্চলের লোক জাতে এবং ভাষায় ইরানি।

অথবা উচিত রুশকে দাবী জানানো; রুশরা যেন তাদের উজবেগিস্থান ও তুর্কিস্থান আফগানিস্থানের হাতে সঁপে দেয় এবং ইরানকে বলা যেন তাবত ইরানভূমি আফগানিস্থানের অংশীভূত হয়ে যায়।

এ-দাবীটা যে কতদূর বেহেস্ত তার একটা তুলনা দি। সুইস জাতি গড়ে উঠেছে তার পশ্চিম অঞ্চলের ফরাসী, উত্তর অঞ্চলের জার্মান ও পূর্ব অঞ্চলের ইতালীয়কে নিয়ে। এই তিন অঞ্চল আবার শব্দার্থে অঞ্চল, কারণ এরা সবাই মূল শাড়ী ফ্রান্স, জর্মনী এবং ইতালির প্রান্ত থেকে খসে পড়ে সুইজারল্যাণ্ডে লুটোচ্ছে। আজ যদি সুইজারল্যাণ্ড ক্ষেপে গিয়ে ফ্রান্স, জর্মনী এবং ইতালিকে সুইস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য দাবী জানায় তবেই তার তুলনা হবে আফগান দাবীর সঙ্গে।

কিন্তু যদিও এ দাবী শুধু পাগলা-গারদেই নির্ভয়ে করা চলে তবু এ ধরনের দাবী আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়। কাবুলীওলাদের সুদের দাবী যে অনেক সময় আসলের বিশগুণ হয়ে দাঁড়ায় সে অনেক মজুরই জানে।

পশতুভাষী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তো কস্মিনকালেও আফগানিস্থানের অংশরূপে পরিচিত হয় নি, বরঞ্চ কান্দাহার—গজনী—কাবুল—জলালাবাদ অঞ্চল (এবং এই অঞ্চলই খাস আফগানিস্থান—এই অঞ্চলের লোকই পশতু বলে এবং 'পাঠান' নামে পরিচিত—পূর্বেই বলেছি বাদবাকি অঞ্চল ইরাণ ও সোভিয়েট তুর্কমানিস্থানও উজবেগিস্থানের অংশরূপে পরিচিত) ভারতবর্ষের অংশ, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে কেটে নিয়ে আফগানিস্থানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই, খেয়ালী দাবীর হাওয়া বইয়ে কাবুলী পাগলকে জাগাল কে?

রুশ।

ফরাসীতে প্রবাদ বাক্য আছে, 'প্লু সা শাঁজ, প্লু সে লা মেম্ শোজ', অর্থাৎ 'যতই সে বদলায় ততই তার চেহারা বেশী করে আগের মত দেখায়।' স্তালিনী গুণীরা যতই তাঁদের বৈদেশিক নীতি বদলাতে চান ততই তাঁদের চেহারা জারের চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। রক্ত-শোষক জার প্রলেতারিয়ারক্ষক স্তালিনের বৈদেশিক নীতিতে আজ আর কোনো পার্থক্য নেই। বাংলা সাহিত্য পাটনির বরাতজোরে 'দুধে-ভাতে' বেঁচে-ওঠা সন্তান। কিন্তু এই উপযুক্ত সঙ্গীন বৈদেশিক নীতি তার ছাপ এই মোলায়েম সাহিত্যের উপরও রেখে গিয়েছে;—

"বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো এক সময়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চিরন্তন জুজু রাশিয়ান কর্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা

তখন ( ইং ১৮৬৮ মে—১৮৭০ ডিসেম্বর ) পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ে কোন্ একটা ছিদ্রপথ দিয়া ( আসলে আফগানিস্থান দিয়ে—লেখক ) যে রুশীয়েরা সহসা ধূমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে তাহা তো বলা যায় না। এইজন্য মা'র মনে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণত-বয়স্ক দলের সহায়তা লাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন, "রাশিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো। মাতার উদ্বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয় কিছুই জানি না। দফতরখানায় মহানন্দ মুনশির শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাটাতে জমিদারি সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিতা লিখিয়াছিলেন—ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাশিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাশিয়ান-ভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না—কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল।" ( রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৭ খণ্ড, ৩০৫ পৃঃ )

যে জুজুর ভয়ের উল্লেখ করে কবিগুরু কাহিনীটি বললেন, আফগানিস্থান আজ সেই জুজুর ভয়ই দেখাচ্ছে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে রুশ তখন যে ভয় দেখাত আজ সেটা প্রকাশ পাচ্ছে আফগানিস্থানের মুখভেংচিতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যও জানি যে রুশ যেমন অন্তরে অন্তরে বুঝত যে আফগানিস্থান শেষ পর্যন্ত ভারত আক্রমণ করতে কখনো রাজী হবে না, আজও তেমনি আফগানিস্থান যত ভেংচিই কাটুক না কেন, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধং দেহি বলে আসরে নামবে না। দোস্ত মুহম্মদ, আব্দুর রহমান, হবিবউল্লাকে রাশা বিস্তর তোয়াজ করেছে ভারত আক্রমণের জন্য। শেষ পর্যন্ত এ-দোহাই পর্যন্ত পেড়েছে যে মুসলিম আফগানের উচিত ভারতীয় মুসলিমকে কাফির ইংরেজের অত্যাচার থেকে মুক্ত করা, কিন্তু কাবুল নদীর জলে কোনো দিব্য-দিলাশার হাল কোনো দিনই কোনো পানি পায় নি। কারণ দোস্ত, রহমান, হবীব তিনজনাই জানতেন, ভারত আক্রমণ করেছ কি সঙ্গে সঙ্গে রুশ কপ্ করে আফগানিস্থানটি গিলে ফেলবে। হিটলারের বহুপূর্বেই কাবুলী গুণীরা জানতেনঃযে একসঙ্গে দুই অঙ্গনে নাচা-কুঁদা যায় না।

অধম ঝাড়া দুটি বৎসর কাবুলে ছিল। কাবুল এমনি নীরস নিরানন্দ পুরী

যে সেখানে বেঁচে থাকতে হলে রাজনৈতিক দাবাখেলায় মনোযোগ করা ছাড়া অন্য কোনো পন্থা নেই। আফগানিস্থানের সৈন্যবল, অস্ত্রবল আমাদের যাত্রার দলের ভীমসেনের গদার মত—ফাঁপা এবং কাঁকরে ভর্তি। শব্দ করে প্রচুর।

আফগানিস্থানের আসল জোর তার পার্বত্যভূমি, তার গিরিসঙ্কটে। তাই দিয়ে সে আত্মরক্ষা করে আর আপন স্বাধীনতা বজায় রাখে। কিন্তু আফগানিস্থান ভারত আক্রমণ করলে তো আর পার্বত্যভূমি, গিরিসঙ্কট আপন কাঁধে করে নিয়ে এসে ভিন্ দেশে কাজে লাগাতে পারবে না।

কিন্তু এসব হল পাকিস্তান এবং ডমিনিয়নের বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি। সে আলোচনা আর একদিন হবে। এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল, আফগানিস্থানের অন্তঃসারশূন্য দাবী নিয়ে আলোচনা করার।

সর্বশেষে বক্তব্য, পাকিস্তান যদি আফগানিস্থানকে নিয়ে কোনো দিন সত্যই বিপদগ্রস্ত হয় তবে ডমিনিয়নের তাতে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শুধু পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ নয়, ভারতেরও বটে।

## সুদিনে দুর্দিনে জর্মনী

চীনের সঙ্গে যে আমাদের হৃদ্যতা আছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এত প্রাচীন, বিরাট, বিপুল দেশ যে একদিন আমাদের রাজাধিরাজ চক্রবর্তী বুদ্ধ তথাগতের দর্শনলাভ না করেও তাঁর পদানত হয়েছিল সে-কথা ভাবতে আমাদের হৃদয়ে গৌরবের সঞ্চার হয়। উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে সেদিন পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক জাত্যাভিমানকে যখনই ইংরেজ অবমানিত করেছে তখনই আমরা আমাদের অধমর্ণ চীনের কথা ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি।

আরেকটি দেশ সে-দুর্দিনে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। সে দেশ জর্মনী। কবিগুরু গ্যোটে শকুন্তলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, শোপেনহাওয়ার উপনিষদের প্রশস্তি গেয়ে জর্মনির বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি ভারতবর্ষের প্রতি আকর্ষণ করেন। ফলে জর্মন পণ্ডিতরা সংস্কৃত ও পালি নিয়ে যে-গবেষণা আরম্ভ করেন সে মণিমঞ্জুষার দশমাংশের সঙ্গেও আমরা এখনো পরিচিত হইনি। ভারতীয় বৈদগ্ধ্যানুরাগীরা কিন্তু জানেন, আচার্য মোক্ষমূলর আর্যাভিযানের বিজয়রথ কি করে

জাহ্নবীর ন্যায় অনুসরণ করেছেন, ইয়াকবি জৈনধর্মের লুপ্তপ্রায় গৌরব উতঙ্কের ন্যায় পুনরুদ্ধার করলেন, তাঁর শিষ্য কির্ফেল অগাধ পুরাণশাস্ত্রে নিমজ্জিত হয়ে মৎস্যাবতারের মত বিরাট পুস্তক 'ইণ্ডিশে কলগনি' মস্তকে তুলে ধরলেন, গেল্ডনার গণপতির ন্যায় ঋগ্বেদ জর্মন ভাষায় অনুলিখন করলেন, উইনটারনিৎস সর্বশেষে সঞ্জয়ের ন্যায় ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ অন্ধ পৃথিবীকে সামসঙ্গীত উদাত্তকণ্ঠে শুনিয়ে দিলেন।

মৃচ্ছকটিকার জর্মন অনুবাদ অন্ততপক্ষে সাতজন লেখক করে গিয়েছেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উপর থিসিস লিখে ক'জন জর্মন, অজর্মন ডক্তরত্ব পেয়েছেন সে-সম্বন্ধেও একখানা থিসিস লেখা যায়।

জর্মন ঔপন্যাসিক টেয়োডোর স্টর্মের 'ঈমেন্‌জে' পুস্তকের গোড়ার দিকে একপাল ছেলেমেয়ে ছোট্ট একখানা গাড়ী বানিয়ে তার মধ্যে গুটিকয়েক বসেছে, বাদবাকিরা গাড়ী টানছে, আর সবাই চেঁচিয়ে বলছে :—

"নাখ্‌ ইণ্ডিয়েন্‌, নাখ্‌ ইণ্ডিয়েন !"

অর্থাৎ

"ভারত চলো, ভারত চলো !"

পিরামিডের দেশ মিশর রইল, ড্রাগনের দেশ চীন রইল, আরবোপন্যাসের বাগদাদ রইল, ছেলেগুলোর মন কেন ভারতবর্ষেরই দিকে ধাওয়া করল কে জানে ? তবু যদি শকটিকাটি মাটির গড়া হত তবু বুঝতুম, কারণ মৃচ্ছকটিকার দেশ ভারতবর্ষ। তবে হাঁ, হয়ত শকটটি ক্ষুদ্র ছিল বলে সে 'হীনযান'কে শরণ করে তারা তথাগতের দেশে পৌঁছতে চেয়েছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য বলেছেন বালকেরা ক্রীড়া করে এবং বৃদ্ধেরা চিন্তা করেন। শকটিকাতত্ত্ব আবিষ্কার করবেন বৃদ্ধেরা চিন্তা করে, বালকের মধ্যে যদি কোনো আবিষ্কার-শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় তবে সে জিনিস নিশ্চয়ই কল্পনাপ্রসূত।

এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জর্মনদের শিশু এবং কবি মনের কল্পনা যে নৈসর্গিকতার বেড়া কতবার ভেঙেছে তার লেখাজোখা নেই। হাইন্‌রিশ্‌ হাইনে যে শুধু সুকবি ছিলেন তা নয়, সুপণ্ডিতও ছিলেন। তিনি পর্যন্ত বলেছেন,—

"কী অপূর্ব দৃশ্য !

শ্যামাঙ্গী সুন্দরী গঙ্গাতটে নতজানু হয়ে গঙ্গাজলে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের উপাসনা করছে।"

পদ্মপূজা ! সে-পদ্মও ফুটেছেন গঙ্গাস্রোতে ! একেই বলে কল্পনা !

ওদিকে ভারতবর্ষও জর্মনিকে প্রচুর সম্মান দেখিয়েছে। আমরা জর্মনিকে যে সম্মান জানিয়েছি তার বেশী দেখানো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী যখন রৌণ্ড-টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করতে বিলেত যান তখন বহু সাংবাদিক মহাত্মাজীকে এদেশ ওদেশ বহুদেশ দেখে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। মহাত্মাজী বলেন যে, একমাত্র গ্যোটের বাইমার দেখবার তাঁর বহুদিনের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

শুনে জর্মনি যে আনন্দধ্বনি করেছিল তার প্রতিধ্বনি জর্মনির বেতারে বেতারে বহুদিন ধরে শোনা গিয়েছিল। জর্মনির বড়কর্তারা তৎক্ষণাৎ দূত পাঠিয়ে মহাত্মাজীকে ষোড়শোপচারে আমন্ত্রণ করেন; হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র মহাত্মাজীকে বেতারে যৎকিঞ্চিৎ বলার জন্য তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে যায় এবং আর সব বেতার-কেন্দ্রের ঈর্ষা তখন যেমন যেমন বিকট হতে বিকটতর রূপ নিতে লাগল, হামবুর্গ বেতারকেন্দ্রের ঢক্কানিনাদ সেই অনুপাতে জর্মনির কর্ণপটহ ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করল। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র প্রথম খবর দিল যে মহাত্মাজী বেতারযন্ত্রের সামনে উপস্থিত হতে স্বীকৃত হয়েছেন তখন প্রচারকের ( এনাউন্সারের ) কণ্ঠে কি গদ্‌গদ ভাব; চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম লোকটা আনন্দে গলে পড়ছে আর 'সখি, আমায় ধরো ধরো' বলে ঢলে পড়ছে; রেডিয়োর আর পাঁচজন তাকে চতুর্দিক থেকে ঠেকো দিয়ে কোন গতিকে খাড়া করে রেখেছে।

তারপর যেদিন দুঃসংবাদ দেবার কাললগ্ন এল যে মহাত্মাজী কনফারেন্সে বিফলমনোরথ হয়েছেন বলে বাইমার আসবেন না তখন সে-প্রচারকের আর সন্ধান নেই। যে দেবদূত মা-মেরীকে যীশুর শুভাগমনের 'সুসমাচার' দিয়েছিলেন তিনি এবং সঞ্জয় কি করে এক ব্যক্তি হতে পারেন?

ভেবেছিলুম অন্যান্য বেতারকেন্দ্র হামবুর্গের কান কাটাতে বগল বাজাবে কিন্তু তার পরিবর্তে শোনা গেল কেন্দ্রে কেন্দ্রে দরদী গলা এবং সবাই মিলে একজোটে কনফারেন্সের বড়কর্তা ইংরেজের পিঠে মারল কিল।

মহাত্মাজী যে বাইমার যেতে পারেননি সে-কথাটা বড় নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষের মহত্তম আদর্শবাদের প্রতীক মহাত্মাজী লণ্ডনে বসে ব্যঞ্জনায় বলেছিলেন, ইয়োরোপে যদি দেখবার মত কিছু থাকে তবে সে হচ্ছে গ্যোটের বাইমার।

* * *

পরদিন চিঠি পেলুম জর্মন সতীর্থ পাউল হর্স্টারের ( Paul Horster ) কাছ থেকে। জর্মনির এখন যা দুরবস্থা এবং ভারতবর্ষের মাথায় এখন যা কাজের চাপ তার মাঝখানে জর্মনির সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে গিয়ে ঠেকেছে জর্মনির পাউল এবং 'ভারতে'র অখ্যাতনামা লেখকের সঙ্গে।

পাউল চিঠি আরম্ভ করেছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে আনন্দ প্রকাশ করে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত আমরা দুজনে রাইনের পারে, ভিনাস পাহাড়ের ( ভেনুস-বের্গ ) উপরে, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায়, কাফের ধুঁয়োর মাঝখানে কখনো উচ্চস্বরে, কখনো নীরবে, কখনো পত্রবিনিময়ে ভারতবর্ষের ভাবী স্বাধীনতা-লাভের সুখস্বপ্ন গড়েছি। আমি বলতাম, ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্বেই আমি মরব। পাউল বাঁকা হাসি হেসে বলত, 'আগাছা সহজে মরে না, কাঁটাতে পোকা ধরে না ; স্বরাজ না দেখার পূর্বে তোমার মত কাঁটা শুকিয়ে ঝরে পড়বে না।'

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন, কিন্তু জর্মনি পরাধীন। সে পরাধীনতা চরমে পৌঁছে-ছিল গেল শীতে। অনাহারে পাউলের দুই শিশুকন্যার যক্ষ্মা হয়, তার স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করেন। ছাত-চোঁয়ানো হিমজলে ভিজে পাউলের নিউমনিয়া হয় ; ভুগুন্তি কপালে এখনো অনেক বাকী আছে বলে পাউল এখনো পটল বা কপি কিছুই তুলতে পারে নি।

পাউল লিখেছে ;

"সুসংবাদ দিয়ে চিঠি আরম্ভ করি। আহারাদির বন্দোবস্ত আগের চেয়ে অল্প ভালো হয়েছে। তার কারণ কিন্তু এই নয় যে, মিত্রশক্তি আমাদের দুর্দশা দেখে বিগলিত করুণায় আমাদের ভিক্ষা দিতে রাজী হয়েছেন। খুব সম্ভব তুমি জানো যে মিত্রশক্তিরা লড়াই জেতার পর স্থির করেছিলেন যে, ১৯৫১ পর্যন্ত—অর্থাৎ লড়াইয়ের যে ছ' বছর আমরা তাদের ভুগিয়েছি, ঠিক সেই পরিমাণ—আমাদের না খাইয়ে মারবেন। কিন্তু কর্তাদের মত বদলে গিয়েছে, এবং তার কারণ—

১। "আমাদের কলকারখানা যদি আগুন নিবিয়ে বসে থাকে তবে হলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, গ্রীস আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবে না এবং তাহলে তাদেরো আমাদেরি মত দুরবস্থা হবে। হলাণ্ড তো গেল বৎসরও তার শাকসব্জী বিনে পয়সায় দিতে রাজী ছিল, কিন্তু ইংরেজ এতদিন অনুমতি দেয়নি (এক বৎসর পরে আজ এই পয়লা তরকারি খেলুম )।"

হলাণ্ড-ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের দুরবস্থা যেন জর্মনির মত না হয় সে দুশ্চিন্তা

ইংরেজের মাথায় কেন ঢুকল সে-কথা পাউল লেখে নি। অনুমান করি, মার্শাল প্ল্যান চালু করে রুশকে ঠেকাবার জন্য এসব দেশের ধনদৌলত বাড়ানো ইংরেজ ও আমেরিকার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২। "বেভিন সায়েব বিপদগ্রস্ত হয়েছেন : আমরা যদি মাল-সরঞ্জাম তৈরী এবং রপ্তানি না করি, তবে আমাদের অন্য কোনো উপার্জন নেই। ইংরেজ জনসাধারণকে তাহলে গাঁটের পয়সা খরচ করে আমাদের খাওয়াতে পরাতে হবে। আর যদি ইংরেজ আমাদের কলকারখানা চালু করতে দেয় তা হলেও বিপদ—আমাদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছে যাওয়ার দরুন আমাদের খাইখর্চা এত তলায় এসে ঠেকেছে যে, আমাদের মাল তৈরী হবে অত্যন্ত সস্তাদরে—জাপান যে রকম একদা অত্যন্ত সস্তা মাল তৈরী করতে পারত—এবং সে সস্তা মাল ইংরেজের রপ্তানী-মালের দাম কমিয়ে দেবে। শেষটায় ইংরেজ ইয়োরোপে আর কিছুই বিক্রি করতে পারবে না।"

ইংরেজ যদি কোনোটাতেই রাজী না হয় তাহলে কি হবে সে কথাটা পাউল লেখে নি। বিবেচনা করি, না খেতে পেলে জর্মনরা হন্যে হয়ে সবাই কম্যুনিস্ট হয়ে যাবে এবং তাই রুশ ভালুককে ঠেকাবার জন্য ইংরেজ জর্মনিকে বাঘের দুধ খাওয়াতেও রাজী আছে।

৩। "আমেরিকার সমস্যা, হয় মার্কিন কলকারখানা পুরোদমে চালু রেখে পশ্চিম ইয়োরোপকে কলকব্জা, মালপত্র দাও—কিন্তু ভোলো না, বিনি পয়সায়—নয় রপ্তানি একদম্ বন্ধ করে দাও, কিন্তু ভোলো না, তাহলে রপ্তানি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন কলকারখানাও বন্ধ হয়ে যাবে এবং বেকার সমস্যা বাড়বে।"

পাউল লেখে নি, কিন্তু বিবেচনা করি, আমেরিকা বাইরের শত্রু রুশের চেয়েও ভেতরের শত্রু বেকার-সমস্যাকে ভয় করে বেশি।

"এদিকে আমেরিকা পশ্চিম ও মধ্য ইয়োরোপে যাতে কম্যুনিজম না ঢুকতে পারে তার জন্য ধনপ্রাণ সব দিতে প্রস্তুত। এই তো সেদিন মার্কিন যখন দেখল ইতালির লোক ভোট্ দিয়ে হয়ত কম্যুনিজম ডেকে আনবে, সেদিনই সে বড় বড় জাহাজ-ভর্তি খানাদানা ইটালিতে পাঠাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিনরা আমাদের খবর পাঠালো যে আমাদেরও রেশন বাড়িয়ে দেবে।

ওদিকে রুশ রেশন বাড়াচ্ছেন জর্মনির আপন এলাকায়। এদিকে মার্কিন রুশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপন অধিকৃত জর্মন অঞ্চলেও রেশন বাড়াচ্ছেন। এত দুঃখেও আমার হাসি পায়, এই নিলামের ডাকাডাকির দস্তুর দেখে।"

শুধু পাউলের নয়, আমাদেরও হাসি পায়। দুদিন আগে যে জর্মনিকে মার্কিন রুশ দুদিক থেকে পাইকারি কিল মেরে ধরাশায়ী করেছিলেন, আজ তাকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্য একজন গলায় ঢালছেন ব্র্যাণ্ডি, অন্যজন নাকে ধরেছেন স্মেলিঙ-সল্টের শিশি! শুধু কি তাই, গ্যোবেল্‌স্ সাহেব মরার পূর্বে যে একখানা সাত-পৌণ্ডী টাইম-বম্ রেখে গিয়েছিলেন সেখানা কানে তালা লাগিয়ে ফেটেছে। গ্যোবেল্‌স্ মার্কিন-ইংরেজের উদ্দেশে বলেছিলেন, "আমাদের যে তোমরা বিনাশ করছ, তার জন্য তোমরা একদিন আফসোস করবে। তোমাদের শত্রু জর্মনি নয়, শত্রু তোমাদের রুশ। এবং সেই রুশের সঙ্গে লড়বার জন্য আমাদের আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে, তোমাদের টাকায় বিয়ার-সসিজ্ খাইয়ে, বাড়ী-ঘরদোর বানিয়ে দিয়ে।"

গ্যোবেল্‌সের সে টাইম-বম্—আমরা বলি ফলিত-জ্যোতিষ—ফেটেছে। রুশের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করতে গিয়ে মার্শাল ট্রুম্যান যে সব বক্তৃতা ঝাড়েন সেগুলো শুনে মনে হয়, ট্রুমান যেন 'মাইন কাম্‌ফ্' পড়ে শুনাচ্ছেন, মার্শালের গলা আর গ্যোবেল্‌সের গলায় তফাৎ ধরতে পারিনে।

শুধু কি তাই, হিটলার একদিন সদম্ভে চেকোশ্লোভাকিরা দখল করেছিলেন—গণতান্ত্রিক চেম্বারলেনের গালে ঠাস্ করে চড় মেরে। ঠিক সেই কায়দায় রুশ যখন সেদিন চেকোশ্লোভাকিয়ার গণতন্ত্র গলা টিপে মেরে ফেলল ( মাজারিক নাকি আত্মহত্যা করেছেন, বেনেশ্ নাকি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন ! ), তখন আমেরিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। জর্মনি চেঁচিয়ে বলল, "কিছু করো না-করো, অন্তত চোখ দুটো তো রাঙা করো।" আমেরিকা চোখ-দুটি বন্ধ করেছে।

ফরাসিতে প্রবাদ আছে, 'প্লু্য সা শাঁজ, প্লু্য সে লা মেম শোজ।' অর্থাৎ 'যতই সে রঙ বদলায় ততই তাকে আগের মতন দেখায়।' অনেকটা বাঙলা দেশের 'কবিতা' লেখকদের মত। যতই তারা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ঢাকতে চান, ততই তাদের লেখাতে সে প্রভাব ধরা পড়ে।

মার্কিন, রুশ, ইংরেজ যতই তাদের রাজনীতি বদলাতে চায় ততই তাদের চেহারা আগের মতন হতে চলে।

জর্মন আবার শক্তিশালী হবে।

* * *

ভুলে গিয়েছিলুম পাউলের চিঠি শেষ হয়েছে প্রশ্ন দিয়ে, "Was fangen die Inder mit der wiedergewonnenen Freiheit an ? Sich gegen-

seitig zu erschlagen kann doch unmoeglich das einzige Ergebnis gewesen sein."

অর্থাৎ, "নবলব্ধ স্বাধীনতা দিয়ে ভারতবাসীরা কি করছে? একে অন্যকে খুন করাই তো আর সে স্বাধীনতার একমাত্র ফল হতে পারে না।"

উত্তরে কি লিখি যদি কেউ বলে দেন!

## এ্যানড্রুজ সাহেব

আমরা ঐ নামেই তাঁকে চিনতুম। আমি তাঁকে গুরুরূপে পাই ১৯২১ থেকে ১৯২৬ অবধি। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গুণী-জ্ঞানীরা তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন। সে-অধিকার আমার নেই।

১৯২১-এর বর্ষায় শান্তিনিকেতনে ভরতি হওয়ার কয়েক দিন পরই জানলুম, আসাম চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য তিনি এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছেন। গুরুদেব তখন বিদেশে। ফিরে এলেন জুলাই মাসে। বোম্বাইয়ে নেমেই নাকি তিনি মহাত্মা গাঁধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একমত হতে পারেননি বলে তাঁর বিরুদ্ধে আপন বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ওদিকে আবার রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ গাঁধীজীকে তাঁর আশীর্বাদ জানিয়েছেন। শুনলাম, এ্যানডরুজ সায়েব রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীজী দুজনারই সখা এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের শিষ্য। এই তিনজনের সখ্য, প্রীতি, স্নেহ তিনি একসঙ্গে পান কি করে? সে যুগে যাঁরা যুবক ছিলেন তাঁরা স্মরণে আনতে পারবেন, এক দিক দিয়ে আমাদের সর্বগর্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, কাব্যাদি নিয়ে, অন্য দিক দিয়ে আমরা যোগ দিয়েছি গাঁধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে। এই দ্বন্দ্বেই আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত। আর এ্যানডরুজ সায়েব এই তিনমুখী লড়াই সামলান কি করে?...এমন সময় শান্তিনিকেতনে খবর পৌঁছল, গুরুদেব ও গাঁধীজীতে নাকি মুখোমুখি বসে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হবে। অন্যে যা বলুন বলুন, আমার বিশ্বাস এই মোলাকাৎটির ব্যবস্থা করেন এ্যানডরুজ সায়েব। তার দু-একদিন পরেই গুরুদেব আর সায়েব আশ্রমে ফিরে এলেন। এবং আমরা আরও দিগ্‌ভ্রান্ত, ওঁদের আলোচনার কোন রিপর্ট কোনো কাগজে বেরোয় নি। এ্যানডরুজ সায়েব সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও কিছু বলেন নি। শুনেছি রুদ্ধদ্বারে চার ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়েছিল। বিশ্বজনের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আর্টিস্ট্‌ ঠেকায় কে?

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ চাবির ফুটো দিয়ে ভিতরকার অবস্থাটা এক পলক দেখে নিয়ে একটি ছবি আঁকেন। সেটি এখন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে।...আশ্রমে ফেরার দু'একদিন পরই সায়েব বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের ডেকে পাঠালেন। সায়েব সর্বপ্রথম বললেন—অর্ধশতাব্দী পরে আমার প্রতিবেদনে যদি ভুলভ্রান্তি থেকে যায় তবে সে-সভায় উপস্থিত কোনো মহাশয় সেটি সংশোধন করে দিলে অধম বড়ই কৃতজ্ঞ হবে—গুরুডেব ( সায়েব 'ড' 'দ'-য়ে তফাৎ করতে পারতেন না ) এবং মহাটমাজী কলকাতাতে যে আলোচনা করেছেন সেটা জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমাদের জানানো দরকার। কিন্তু তোমরাও সেটি কাগজে প্রকাশ করো না।'

আহা, কী সুন্দর ইংরেজি উচ্চারণ! এতদিন যা দু-চারবার ইংরেজের মুখে ইংরেজি শুনেছি তার চৌদ্দ আনা বুঝতে পারি নি। তারা ছিল চা-বাগানের মালিক। খুব সম্ভব ককনি। আর ইনি যা বলছেন তার প্রত্যেকটি শব্দ বুঝতে পারছি। যদিও তাঁর কথাগুলো বিরাট দাড়িগোঁফের মাঝখান দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে বেরুচ্ছিল।

পরদিন নোটিশ বেরুল সায়েব আমাদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ক্লাস নেবেন। অধ্যক্ষ বিধুশেখরের বারান্দায়। হায়, আজকের লোক বুঝতে পারবে না, আমাদের কী স্থানাভাব ছিল! ব্ল্যাকবর্ড ছিল না বলে সায়েব বারান্দার মেঝেয় সঙ্গে আনা চক দিয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তুর শিরোনামা লিখতেন। বিরাট দেহ। সমস্ত রক্ত চলে আসতো দাড়ি আর চোখের মাঝখানে।...

ঘণ্টা বাজলো। সায়েব ছুটলেন তাঁর থালা আনতে। সে-আমলে সব্বাইকে যেতে হত আপন আপন থালা নিয়ে রান্নাঘরের পাশে ডাইনিংরুমে। কিন্তু বিদেশীদের অন্য ব্যবস্থা ছিল। সায়েব সেখানে মাঝে-মধ্যে যেতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ খেতেন আমাদের সঙ্গেই।...তারপর সায়েব পড়ালেন শেকসপীয়র এবং আমাদের অনুরোধে নিউ টেসটামেণ্ট। কিন্তু কোনো বইই তিনি শেষ করার সুযোগ পেতেন না। আজ ঐ হোথায় পাঞ্জাবে না কোথায় পুলিস মজুরদের কোথাও—ব্যাস্ হয়ে গেল। তাঁর ক্লাস বন্ধ।

কিন্তু কে শুনতে চায় আজকের দিনে এ-সব কাহিনী!

# যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও নব রাষ্ট্র নির্মাণপ্রচেষ্টা বহু মহাপুরুষের দেশপ্রীতি এবং আত্মত্যাগ দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সঙ্গে আরো দুটি কথা স্বীকার করতে হয় যে ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও এর জন্য অংশত দায়ী। তাই ভারতীয় রাষ্ট্র ভবিষ্যতে কি রূপ নেবে সে আলোচনা করতে গেলে ঐ তিনটি জিনিসেরই প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

কোনো ভূখণ্ড পরাধীন হয়ে গিয়েছিল, ফের স্বাধীন হল এ পরিস্থিতি পৃথিবীতে বহুবার হয়ে গিয়েছে এবং তার নক্সা প্রতিবারেই কিছু না কিছু আলাদা হয়েছে। তাই যে সব দেশের সঙ্গে আমাদের কিছুটা মিল আছে তাদের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলে ভবিষ্যতের ভারত সম্বন্ধে কিছুটা আবছা-আবছা ধারণা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরব ভূখণ্ডের এক বৃহৎ অংশ, তুর্কী, ইরান ও আফগানিস্থান স্বাধীন হয়ে যায়। এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা এ প্রবন্ধ যে মূল সূত্র নিয়ে আরম্ভ করছি তার-ই পুনরাবৃত্তি করতে হয়। কিন্তু উপস্থিত দ্রষ্টব্য এই সব দেশ তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা নিয়ে করলো কি?

মুস্তফা কামাল ধর্মে বিশ্বাস করতেন না—এ বিষয়ে তিনি যে সম্পূর্ণ একা ছিলেন তা নয়, তুর্কী পল্টনের বিস্তর আপিসার ফ্রান্স অথবা জর্মনিতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে ধর্মের প্রতি এঁদের কোন প্রকারের শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি যখন স্বাধীনতা লাভের পর দেশ নির্মাণ শুরু করলেন তখন বুনিয়াদি স্বার্থ ধর্মের মুখোশ পরে তাঁকে প্রতিপদে বাধা দিতে লাগলো। একে তো মুস্তফা কামাল জাত কালা-পাহাড় তার উপর তাঁর শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম। জীবনটাকে তিনি একটা আস্ত জুয়ো খেলা বলে ধরে নিয়েছিলেন বলেই শত্রুর সামান্যতম পণের বিপক্ষে তিনি গোটা জীবনটাকে পণ ধরে 'খেলায়' নামতেন। এ রকম লোক হয় তিন দিনেই দেউলে হয়, অর্থাৎ আততায়ীর হাতে প্রাণ দেয়, কিম্বা কোটিপতি হয় অর্থাৎ শত জীবন লাভ করে। তাই মুস্তফার কাছে প্রতি বাজীতে মোল্লাদের নির্মম হার মানতে হল। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আজ যদি পণ্ডিতজী হুকুম দেন গায়ত্রী সংস্কৃতে উচ্চারণ না করে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে পড়তে হবে তবে তাবৎ ভারতবর্ষে কি রকম বিরাট আন্দোলন সৃষ্ট হবে। অথচ মুস্তফা কামাল ঠিক ঐ হুকুমটিই জারী করেছিলেন—আজান আরবী ভাষায় না দিয়ে দিতে হবে তুর্কীতে,

নামাজের মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে তুর্কী ভাষায়!

আফগানিস্থানের বাদশা আমান উল্লাও আপন দেশটাকে গড়ে তুলতে গিয়ে দেখেন মোল্লারা শত্রুতা সাধছেন। তিনিও তখন রুদ্ররূপ নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একে তো তিনি মুস্তফার মত জোয়াড়ি ছিলেন না, দ্বিতীয়ত তাঁকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর মত স্বাধীনচেতা জোয়ান আফগানিস্থানে ছিলেন অতি অল্পই। আরো কারণ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ দুটো কারণই তাঁর পরাজয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু আসল যুদ্ধটা লাগলো আরবে। একদিকে ইব্‌ন্ সউদ, অন্যদিকে কট্টরতম মোল্লার পাল। তুর্কী-আফগানিস্থান ইসলাম ধর্মের পীঠভূমি নয়, এ সব দেশের লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করে ইসলাম নিয়েছে। কিন্তু আসল ইসলাম জন্ম নেয় আরব দেশে, আরবের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য যা কিছু তার সবই ইসলামের চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে, ইসলাম ছাড়া অন্য সভ্যতার সঙ্গে তারা বহু যুগ ধরে কোনো সংস্পর্শে আসে নি বলে জগতের অন্য কোনো চিন্তাধারা, অন্য কোনো জীবন-সমস্যা সমাধান যে হতে পারে সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। লোকমুখে তারা শুনেছে, আরবের বাইরে রমণীরা উচ্ছৃঙ্খল, পুরুষেরা নাস্তিক, ধর্মের বন্ধন সেখানে একেবারেই নেই, সেখানকার নরনারী নির্লজ্জতায় পশুরও অধম।

গোড়ার দিকে ইব্‌ন্ সউদ নিজেও ঐ দলেরই ছিলেন কিন্তু নজ্‌দ্ ও হিজজাজের রাজা হওয়ার পর তিনি যখন রাজ্য গঠন কর্মে নিযুক্ত হলেন তখন দেখেন ইউরোপীয় যন্ত্রপাতি ভিন্ন কৃষি বাণিজ্য কোনো প্রতিষ্ঠানেরই দ্রুত এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নতি করা অসম্ভব। এ তত্ত্বটি তিনি তখন ধীরে ধীরে মোল্লা সম্প্রদায়কেও বোঝাতে চেষ্টা করলেন—ওদিকে আবার প্রগতিশীল মিশর থেকে প্রত্যাবর্ত যুবক সম্প্রদায় দু'একখানা মোটর গাড়ী, কিছু কিছু গ্রামোফোনও সঙ্গে আনতে আরম্ভ করেছেন, মোদ্দা কথা ধর্মের দোহাই দিয়ে আজকের সংসারের আনাগোনা, যোগাযোগ কি করে সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়?

মোল্লারা ক্রমে ক্রমে নরম হলেন। তখন প্রশ্ন উঠল বন্দুক-কামান ডাইনামো-ট্র্যাকটর কেনবার মত কড়ি ইব্‌ন্ সউদের কোথায়—আরবের মরুভূমি এমন কি ফলায়, যার বদলে এ সব কেনা যায়? তখন দেখা গেল সউদী আরবের মাটির তলায় প্রচুর পেট্রল। ইব্‌ন্ সউদ সেটা মার্কিনদের কাছে বিক্রী করে পেলেন কোটি কোটি ডলার। তাই দিয়ে অনেক কিছু হল—এখন ইব্‌ন্ সউদের প্রাসাদে লিফট্ হয়েছে, সে প্রাসাদ এ্যার-কণ্ডিশন্‌ড্। আবার সেই টাকার জোরেই মিশর এবং ভারতবর্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ কুরান কেনা হচ্ছে এবং আরবদের মধ্যে বিতরণ করা

হচ্ছে (সউদী আরবে ছাপাখানার ব্যবস্থা ভালো নয় বলে বোম্বাই লক্ষ্ণৌয়ে নওলকিশোর প্রেসে ছাপা কুরান সেখানে যায়, কলকাতা থেকে এখনো ঢাকায় লক্ষ লক্ষ কুরান যায়)। ওদিকে সউদী আরবের কোনো কোনো শহরে গোপনে গোপনে স্কচ্ পানও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

আরবের 'ধর্মে' ও ইয়োরোপের 'অধর্মে' খানিকটা সমঝাওতা হয়ে গিয়ে থাকা সত্ত্বেও একথা মানতে হবে যে ইয়োরোপীয় চিন্তাধারা এখনো মক্কা-মদীনাতে প্রবেশ করতে পারে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরো চারটি দেশ স্বাধীন হয়ে গণতন্ত্র নির্মাণ করেছে—ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বর্মা এবং ইন্দোনেশিয়া, মিশরও যুগধর্ম রক্ষা করে গণতন্ত্র হতে চললো এবং চীন কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতা-লাভের প্রথম কট্টর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যে। তারা রাতারাতি তাবৎ ডাচ্ রাস্তার নাম, প্রতিমূর্তি, স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে চুরমার করে দিল (আমাকে এদেশে আগত ইন্দোনেশিয়ানরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে আমরা এখনো ময়দানে ব্রিটিশ প্রতিমূর্তিগুলি বরদাস্ত করি কেন, উত্তরে আমি বলি, কলা হিসেবে এগুলো এতই নিম্নশ্রেণীর যে এগুলো রেখে দিলেই ইংরেজ মাথা হেঁট করবে, অন্যান্য বিদেশী মৃদু হাস্য করবে)।

কিন্তু তাই বলে ইন্দোনেশিয়া ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে বর্জন করলো না। ওলন্দাজদের পরিবর্তে তারা এখন ইংরেজি সভ্যতার কিছুটা গ্রহণ করার চেষ্টায় আছে। সুতান শহরীরের মত আরো অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি ইন্দোনেশিয়ায় আছেন—এঁরা পণ্ডিত নেহরু গোত্রীয়, এঁরা ইয়োরোপীয় সভ্যতার আওতায় বড় হয়েছেন এবং দেশের ঐতিহ্যকে জাতীয়তাবাদী হিসেবে শ্রদ্ধা করলেও সে ঐতিহ্যের সঙ্গে এঁদের যোগসূত্র সূক্ষ্ম এবং ক্ষীণ।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সউদী আরবের মত ইন্দোনেশিয়ায়ও ধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। নব রাষ্ট্র-নির্মাণে এঁদের বিশেষ একটা হক্কও ছিল—শহরীর সুকার্নোর বহু বহু পূর্বে এঁরা হজে যাওয়ার ফলে মক্কা-মদীনার প্ররোচনায় দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এঁরা যে ভূমি নির্মাণ করেছিলেন তারই উপর শহরীর সম্প্রদায় তাঁদের ফুলের বাগান সাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি, স্বদেশ-জাত ধর্মের বেলায় মানুষ যে রকম উত্তেজনা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য চেষ্টা করে বিদেশাগত ধর্মের জন্য—বিশেষতঃ এই জাতীয়তাবাদের যুগে—মানুষ অতখানি করে না। তাই

ইন্দোনেশিয়ার মোল্লা সম্প্রদায় ইরানের কশানী সম্প্রদায়ের মত বহু বল ধারণ করলেও এখনো 'আধুনিক' সম্প্রদায়ীদের আসনচ্যুত করতে পারেন নি।

বর্মাতে ধর্মান্দোলন আরো কম, আর পাকিস্তানের খবর সকলেই অল্পবিস্তর রাখেন। চীন কম্যুনিস্ট, তবু চীন সম্বন্ধে একটি কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে —চীনে ধর্ম এবং সমাজ আলাদা আলাদা থাকে বলে ধর্ম সেখানে অনেকটা আমাদের দার্শনিক মতবাদের মত। এদেশে পিতা যদি বেদান্ত মানেন, পুত্র যদি সাংখ্যবাদী হন এবং নাতি যদি যোগশাস্ত্রের চর্চা করেন তবে তিনজনকে পৃথক পৃথক বাড়ী বানিয়ে আলাদা আলাদা বসবাস করতে হয় না। তাই চীনে একই বাড়ীতে এক ভাই বৌদ্ধ, দ্বিতীয় মুসলমান, তৃতীয় খৃষ্টান এবং এঁরা একই বাড়ীতে নির্বিবাদে গুষ্ঠিসুখ অনুভব করেন। তিন ভ্রাতাই কিন্তু চীনা ঐতিহ্যের সম্মান করেন এবং তাই আজ চীন ১৯১৭ সালের রুশ বলশেভিকদের মত আপন বৈদগ্ধ্য 'বুর্জুয়া নামে গালাগাল দিয়ে চীন-দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় নি। বরঞ্চ গুণীদের মুখে শুনতে পাই মাওৎসেতুঙ্ যখন কম্যুনিজম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তখন বিশেষ করে চোখে পড়ে তার নিজস্ব চীনা রূপ—ভাব, ব্যঞ্জনা, অলঙ্কার প্রয়োগে মাও নাকি খাঁটি চীনা ঐতিহ্য মেনে চলেন।

এ স্থলে একটি কথায় বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। প্রাচ্যের কোনো দেশই ভারতীয়দের মত অতখানি ইংরেজি পড়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতার আওতায় পড়ে নি —এমন কি তুর্কীও অতখানি ফরাসী শেখে নি। ইয়োরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস-লেখন-পদ্ধতি, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি আমাদিগকে যতখানি প্রভাবান্বিত করেছে তার শতাংশের একাংশ অন্য কোনো প্রাচ্য দেশে হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি, আমরা সংস্কৃত, বাঙলা সব কিছু ভুলে গিয়ে প্রায় একশ' বৎসর ধরে ইংরেজির মাধ্যমে সর্বপ্রকারের জ্ঞানচর্চা করেছি—চীন কিংবা আরব একদিনের তরেও করে নি। তাই আজ আমরা বাঙলায় ফিরে গিয়ে ইংরেজি ভাবের বাঙলা অনুবাদ করার সময় শব্দের সন্ধানে মাথা কুটে মরি। চীন আরবে এ সমস্যা অনেক সরল, নেই বললেও চলে এবং ঠিক তেমনি তাদের সাহিত্য বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক সাহিত্য কলার সম্পদ আহরণ করে অতখানি বিত্তমান আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য, কলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মত হতে পারে নি।

এই বিত্ত এই সম্পদের বিরুদ্ধে ভারতেও একদল ওয়হ্হাবী ( আরবের কট্টর ), কশানী সম্প্রদায় দেখা দিয়েছেন। এরা সকলে মিলে যে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক সম্প্রদায় করেছেন তা নয়, যে কোনো রাজনৈতিক দলের ভিতর এই মতবাদের

বিস্তর লোক পাওয়া যায়। এঁদের ধারণা যে খুব স্পষ্ট তাও নয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, এঁরা চান অতীতের কোনো 'সত্যযুগে' ফিরে যেতে, এদের বিশ্বাস ভারতের ইতিহাসে এ রকম পাপতাপহীন যুগ ছিল এবং সে যুগে ফিরে যাওয়া অসম্ভব নয়।

আমি ধর্মে বিশ্বাস করি, ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি। কিন্তু সত্যধর্মের জন্য আমাকে পশ্চাতের কোনো বিশেষ যুগে ফিরে যেতে হবে এ কথা বিশ্বাস করি না। ধর্মে বিশ্বাস করি বলেই কায়মনোবাক্যে মানি,

"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখ্য॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি

চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত তাহার আর শ্রীর অন্ত নাই, হো রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনিয়াছি। যে চলে দেবতা ইন্দ্রও সখা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলিতে চাহে না, সে শ্রেষ্ঠ জন হইলেও সে ক্রমে নীচ (পাপী) হইতে থাকে, অতএব, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।"

এবং ধর্মের চেয়েও বেশী মানি ভারতীয় বৈদগ্ধ্যকে—যে বৈদগ্ধ্যকে আমরা এতদিন অবহেলা করেছি।

যদি জানতুম যে ইয়োরোপীয়, আরব কিংবা চীনা বৈদগ্ধ্যের তুলনায় ভারতীয় বৈদগ্ধ্য বিত্তহীন তাহলে হয়ত আমি সনাতন পন্থায় সে বৈদগ্ধ্য নিয়ে আলোচনা করতুম, কোনো বিশেষ যুগের বিশেষ বৈদগ্ধ্য আঁকড়ে ধরে বসে থাকতুম, কিন্তু দেখছি দেশে দেশের মাঝখানের সর্বপ্রকার ভৌগোলিক বাধা প্রায় লোপ পেতে বসেছে, আজ যেমন ইংরেজী ফরাসী জর্মন বৈদগ্ধ্য একে অন্যের গোপনতম সম্পদের খবর রাখে ঠিক তেমনি সেদিন শীঘ্রই এসে উপস্থিত হবে যখন ভারতীয় বৈদগ্ধ্যকে আর সব বৈদগ্ধ্যের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। আমার সম্পদকে তখন তাদের সামনে এমনভাবে সাজিয়ে দিতে হবে, তাকে এমনি ধরণে যুগধর্মোপযোগী করতে হবে যে বিশ্বজন যেন তাকে বুঝতে পারে, এবং তারপর এগিয়ে চলতে হবে তাদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে, ইয়োরোপ, চীন, আরবের সর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলার সর্বোত্তম নিদর্শন গ্রহণ করে, ভারতীয় সম্পদ দান করে।

তাই ভারতের ভাগ্যবিধাতা নিয়ে চলেছেন,

'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীকে'
তারা দাঁড়িয়ে নেই—তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না॥

# ভাষার হাটে বেইমানি

একদা এদেশে মুসলমানী সভ্যতা-সংস্কৃতি এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে বাঙলার সভ্যতা, বেশভূষা, আলাপ-আচরণে অনেকখানি মোগলাই-মোগলাই রং ধরেছিল। আমার নমস্য গুরুজন জয়রাম মুন্সী চোগা-চাপকান পরতেন আর বড় বড় মজলিসে তাঁর ফার্শী বয়েত আওড়ানো শুনে দেশবিদেশের জমায়েৎ মৌলবী-মওলানারা শাবাশ শাবাশ বলতেন। তারপর আমরা একদিন কোটপাতলুন পরে কাঁটা-চামচ দিয়ে খেতে আরম্ভ করলুম আর আমাদের ইংরেজি কপচানো শুনে দেশ-বিদেশের লোক ধন্যি ধন্যি বললে। সেদিনও গেছে—হরেদরে আমরা সব কিছু সামলে নিয়ে এখন আবার অনেকখানি সম্বিতে ফিরেছি।

আরবী-ফারসী থেকে শব্দ সঞ্চয় করার ফলে বাঙলা ভাষা গতিবেগ পেল সে কথা পূর্বেই একদিন নিবেদন করেছি। 'আলাল', 'হুতোমের' জোয়ার কেটে যাওয়ার পর বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাঙলা ভাষা এমন জায়গায় এসে দাঁড়ালো যেখানে সে অনায়াসে গুরু-গম্ভীর ভাবাবেগ প্রকাশ করতে পারে, আবার চাষী বউয়ের কান্নাহাসিরও ঠিক ঠিক খবর দিতে জানে। এ ভাষা দিয়ে যে রকম 'প্রাচীন সাহিত্যের' মন্দ্ররব শোনানো যায় ঠিক তেমনি 'রামের সুমতি'র মত ভেজা ভেজা ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কাহিনীও শোনানো যায়—শুধু শব্দ আর বাচনভঙ্গীর বেলায় একটুখানি হিসেব করে নিলেই হল।

উনবিংশ শতকের শেষ আর এ শতকের গোড়ার দিকে যে হিন্দী লেখা হত সে হিন্দীও মোটামুটি এই কায়দায়ই রচনা করা হত। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ হিন্দীলেখক উত্তম উর্দুও জানতেন বলে তাঁদের হাতের নাগাল রইত বিস্তর আরবী-ফারসী শব্দ—কারণ বাঙলা যে রকম শব্দভাণ্ডারের জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করে সংস্কৃতের উপর, উর্দু নির্ভর করে আরবী-ফারসীর উপর। আরবীর শব্দ-ভাণ্ডার সংস্কৃতেরই মত বিরাট (সংস্কৃতের মত আরবীও আপন ধাতু থেকে অসংখ্য শব্দ বানাতে পারে, যথা 'জালাসা'= 'বসা,' তার থেকে 'মজলিস', 'এজলাস' ইত্যাদি) এবং বাঙলায় যে রকম যে কোনো—তা সে 'ক্রন্দসী'র মত অজানা শব্দই হোক না কেন—সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার 'শাস্ত্রাধিকার' আছে, উর্দুও ঠিক সেই রকম আরবীর লক্ষ লক্ষ শব্দের যে-কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারে।

তারপর হিন্দীতে এল ভাষাশুদ্ধীকরণের 'বাই'। তার ফলে সে ভাষা বিদ্যেসাগরী ভাষার রঙ না ধরে ধরলো সং। কারণ বিদ্যেসাগর মশায়ের মত ওরকম

জবরদস্ত লেখক হিন্দীতে কেউ তখন ছিলেন না। তবু সে ভাষা আরবী-ফারসী বিকটভাবে বর্জন করে নি বলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তখনো তর্জমা করা হত।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর কিন্তু এ 'বাই' চরমে গিয়ে পৌঁছল। আমরা বাঙলায় বলি 'তারপর' কিম্বা 'তার বাদে' ("বাদ" শব্দটা আরবী সে কথা আমরা বেবাক ভুলে গিয়েছি) হিন্দীতে মাত্র একটি উপায়ে বলা যায় এবং সেটি হচ্ছে 'উস্‌কে বাদ'। হিন্দীওলারা তাই সেই 'বাদটুকু'কে পর্যন্ত বাদ দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন 'উস্‌কে পশ্চাৎমে'!

বছর তিনেক পূর্বে শ্রীযুত অমরনাথ ঝা'র একটি ভাষণ আমি শুনি। পূর্ণ অর্ধ ঘণ্টা ভদ্রলোক অতি বিশুদ্ধ হিন্দীতে বক্তৃতা দিয়ে শেষ করলেন এই কথা বলে 'অব জো হমারী রাষ্ট্রভাষা হোগী বহ সংস্কৃতময়ী হিন্দী হোগী' অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রভাষা 'সংস্কৃতময়ী' হবে।

শ্রী ঝা তাঁর অর্ধঘণ্টাব্যাপী ভাষণে একটিমাত্র আরবী কিম্বা ফার্সী শব্দ ব্যবহার করলে না।

আজ তাই হিন্দী ভাষা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে সে অনায়াসে 'সীতার বনবাস' অনুবাদ করতে পারে, কিন্তু 'রামের সুমতি' কিম্বা 'গড্ডলিকা' করতে পারে না।

এ বড় মারাত্মক অবস্থা—সেই কথাটি আমি পাঠককে বলতে চাই। কারণ একথা ভুললে চলবে না, গণ-আন্দোলনের ফলেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনির্মাণের জন্য জনগণের সহযোগিতার প্রয়োজন। চাষা-ভূষোর সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা নিয়ে আমাদের বই লিখতে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে, নাটক সিনেমা বানাতে হবে। এসব জিনিস বিদ্যেসাগরী বাঙলা দিয়ে যে রকম প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ঠিক তেমনি আজকের দিনে হিন্দী দিয়েও প্রকাশ করা যায় না। একেবারে যায় না বলা অনুচিত, কিন্তু সে ভাষা যে সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে না তাই নয়, সে ভাষা অবোধ্য।

সুশীল পাঠক হয়ত অতিষ্ঠ হয়ে বলবেন, হিন্দী কি করে না-করে তা নিয়ে তোমার অত শিরঃপীড়া কেন?' কথাটা খুবই ঠিক, কারণ হিন্দী আমার মাতৃভাষা নয়, হিন্দী নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে আমার কিম্বা আপনার ব্যক্তিগত কোনো লাভক্ষতি নেই—অবশ্য যতক্ষণ হিন্দী আপন জমিদারিতেই দাবড়ে বেড়ায়, আমাদের পাকা ধানে মই না দিতে আসে।

সেইখানেই তো বিপদ। মেনে নেওয়া হয়েছে হিন্দী আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে

ও ক্রমে ক্রমে বাঙালী, আসামী, মাদ্রাজী সবাইকে যে শুধু হিন্দী পড়তে হবে তাই নয়, সে ভাষায় লিখতে হবে, বলতেও হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র-নির্মাণের কর্ম অনেকখানি হিন্দীর মাধ্যমে করতে হবে। আজকের দিনের ছুঁৎবাইগ্রস্ত হিন্দী দিয়ে কি সে-কর্ম সুচারুরূপে সমাধান হবে?

রসিকতা বাদ দিন। পরশুরামের 'ছি ছি বলিয়া তৃপ্তি হয় না, তওবা, তওবা বলিতে ইচ্ছা করে'র অনুবাদ তো হয়ই না, ইংরেজকে যে খেদাতে হবে 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে' সেই জোরালো বাঙলা পর্যন্ত অনুবাদ করা যাবে না। কারণ 'আব্রু', 'ইজ্জৎ' ,ইমান শব্দ ফারসী-আরবী—হিন্দী এ শব্দগুলো বরদাস্ত (থুড়ি! 'সহ্য') করবেন না। 'আব্রুর' সংস্কৃত কি জানিনে, 'ইজ্জৎ' না হয় কেঁদে-কুকিয়ে 'মান' দিয়ে চালালুম, কিন্তু 'ইমান' শব্দের সংস্কৃত নেই সেকথা নিশ্চয় জানি। 'বেইমানির' জায়গায় বিশ্বাসঘাতকতা' চালাতে গেলে 'ভাষার হাটে বেইমানি' করা হয়।

যে ভাষা রাষ্ট্রভাষা হতে চায় তার শব্দভাণ্ডার হবে বিরাট। কারণ বহু প্রদেশের নানা রকম চিন্তাধারা তাকে প্রকাশ করতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন মত নানা প্রদেশ থেকে নানারকম নূতন শব্দও তাকে গ্রহণ করতে হবে—ইংরেজি যেমন নানা দেশ থেকে নানা রকমের শব্দ নিয়ে আপন ভাষা বিত্তবতী করেছে।

যে ভাষা আপন শব্দভাণ্ডার থেকে অকাতরে খেদিয়ে দিচ্ছে বিস্তর শব্দ শুদ্ধমাত্র 'পবিত্র' হওয়ার জন্য সে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে নানাপ্রকারের শব্দ নিতে রাজী হবে সে আশা দুরাশা।

আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে হিন্দী সাহিত্যিকদের ভিতর এমন লোকও আছেন যাঁরা শ্রী ঝা'র সমর্থন করেন না।

## ধৈর্যং কুরু! পুনঃ গচ্ছেৎ ঢাকায়

গত পঁচিশ বৎসর ধরে কী ঘটি কী বাঙাল কলকাতায় মাছের বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় দিবাস্বপ্ন দেখেছে, আহা ঢাকার লোক কী সুখেই না আছে। বিশেষ করে বাঙাল ছেলেমেয়েরা বাচ্চা বয়েস থেকে মা মাসীর কাছ থেকে ঢাকা, বিক্রমপুর, গোয়ালন্দী ইস্টিমারের বিশ্বভুবনে অতুলনীয় রাইসকারির কথা শুনেছে। ঢাকার কই? সে তো ঘটিদের ইলিশের সাইজ। আর হোথাকার ইলিশ? সে তো তিমি মাছের সাইজ। গোটা পৃথিবীটা নাকি কোন্ এক প্রাণীর মাথায় বিরাজ

করছে—কিন্তু খাস ঢাকাইয়া মাত্রই জানে ঢাকার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। সৃষ্টির আদিম প্রভাতে ব্রহ্মাণ্ড অলিম্পিকে যে তিনটে ইলিশ হেভি-ওয়েট প্রাইজ পায় সেই তিনটির উপর ঢাকা শহর নির্মিত। এ তত্ত্ব আপনার অজানা থাকলে চেপে যাবেন —নইলে ইলশায় হাসবো।

তদুপরি ঢাকার নবাববাড়ির আওতায়, দীর্ঘ তিনশ' বৎসর ধরে নির্মিত মোগলাই খানা! মোগলাই রান্নার উৎপত্তিস্থল দিল্লী-আগ্রা। একটা শাখা গেছে লক্ষ্ণৌয়ে, অন্য শাখা যমুনা বেয়ে বেয়ে এলাহাবাদ, কাশী থেকে একটু মোড় নিয়ে মোগলসরাই, ফের গঙ্গা বেয়ে পাটনা তারপর মুর্শিদাবাদ। ওদিকে পদ্মা বেয়ে বেয়ে ছোট নদী ধরে ঢাকা। রান্নার শেষ তীর্থ সিলেট—কারণ ওটা পাঠান-মোগল উভয়েরই শেষ সীমান্ত নগরী।

বিক্রমপুর উল্লেখ করলুম কেন তবে? সে তো গ্রাম—আজ না হয় মেনে নিলুম ওটা মহকুমা সাইজ ধরে। এবং এ তো অতিশয় সুপরিচিত সত্য যে, কোনো একটি বিশেষ রন্ধনপদ্ধতি (ফরাসিতে কুইজিন—এবং এই শব্দটিই এখন আন্তর্জাতিক) গ্রামাঞ্চলে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

পাঠান-মোগলের পূর্বে বিক্রমপুর ছিল হিন্দুরাজাদের রাজধানী। এই তো কিংবদন্তী। জঙ্গীলাটরা যেরকম যুদ্ধের পর যুদ্ধের কালানুক্রমিক নির্ঘণ্ট থেকে সে-দেশের ইতিহাস নির্মাণ করেন, এ-রসনা পূজারী রন্ধনপদ্ধতির (কুইজিনের) উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ধরে ধরে সে দেশের ইতিহাস নির্মাণ করে। জনশ্রুতি যদি সেখানে আমার কুইজিন-ইতিহাসকে সায় দেয় তবে সেই জনশ্রুতিই সত্য ইতিহাস—বাঁড়ুয্যে সরকার সেস্থলে অপাংক্তেয়।

বিক্রমপুরের কুইজিন ছিল মৎস্যকেন্দ্রিক। ঢাকার মোগলাই রান্না স্পষ্টতই মাংসকেন্দ্রিক। কিন্তু তাই বলে বিক্রমপুরকে ঠেকানো যায় নি। বস্তুতঃ, এই ঢাকাতেই আপনি পাবেন মৎস্য-মাংস কুইজনের বিরলতম সমন্বয়—গঙ্গা-যমুনার সম্মেলন। এ তীর্থে যে বঙ্গজন আসে না তার পিতা নির্বংশ হোক্ (এটা বিদ্যেসাগর থেকে চুরি)। যে এ তীর্থের প্রসাদ বেক্তেয়ার হয়ে উদরে ধারণ এবং পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় সে আখেরে যাবে বেহেশতে যেখানে বিস্তর সুদূর নিস্তরঙ্গ নহর্-তরঙ্গিণী মৌজুদ এবং বলা বাহুল্য সেগুলোতে ইলিশ আবজাব করছে, কোনো প্রকারে সীজ্‌ন্, অফ্‌ফ্ সীজনের তোয়াক্কা না করে। সৃষ্টিকর্তা ভক্তের মনোবাঞ্ছা কদাচ অপূর্ণ রাখেন না। আর সে যদি হিন্দু হয় তবে অতি অবশ্যই সে তদ্দণ্ডেই যাবে শিবলোকে, অর্থাৎ তার বাসস্থান হবে শিবশম্ভুর জটালোকে যেখান থেকে

বেরিয়েছেন,

দেবী সুরেশ্বরী / ভগবতী গঙ্গে
ত্রিভুবন তারিণী, / তরল তরঙ্গে।

আর একথা কি আমার মত যবনকে তৈলবট গ্রহণ করে বিধান দিতে হবে যে সে গঙ্গায় বিরাজ করেন ইলিশ শুধু ইলিশ, দূরদিগন্তব্যাপী ইলিশ।

* * *

কিন্তু হায়, পদ্মার ইলিশ পরিপাটিরূপে রাঁধবার জন্য সুনিপুণা বিক্রমপুরাগতা লক্ষণা সমাজ—বিশেষ করে বৈদ্য বর্ণোদ্ভবা। এ বর্ণের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব পাঠক ক্ষণতরে বিস্মৃতির বুড়ীগঙ্গায় ভাসিয়ে দিন। এঁদের একেকটি যেন সাক্ষাৎ ভানুমতী। এঁদের হাতে কই ইলিশ থেকে আরম্ভ করে এন্তেক কেঁচকি চুনোপুঁটি পর্যন্ত না জানি কোন্ ইন্দ্রজালের মহিমায় এমনই এক অপরূপ সত্তায় পরিণত হন যে তখন তাঁরই রসে সিক্ত রসনা গেয়ে ওঠে :—

ইহাকে জানেন যাঁরা
জগতে অমর তাঁরা
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

* * *

কোথায় আজ সে নবাববাড়ি যাকে কেন্দ্র করে একদা পূর্বাচলের মোগলাই কুইজিন গড়ে উঠেছিল? কলকাতার গোড়াপত্তন থেকেই সে ভুইফোঁড় আপস্টার্ট। কাজেই সেখানে অল্পকালের মধ্যেই দেখা দিল হোটেল, রেস্তরাঁ, চায়ের দোকান, মায় পাইস হোটেল এবং এদানির কফি হৌসগুলো। যদ্যপি একশ' বছর পূর্বেও কলকাতায় প্রবাদ ছিল, বাঙাল দেশের জাত মারলে তিন সেন। উইলসেন, কেশব সেন আর ইস্টি শেন। উইলসনের হোটেল, কেশব সেনের ব্রাহ্মধর্ম আর স্টেশনে তো জাত মানার উপায়ই নেই। ঢাকাতে সে-রকম হুশ হুশ করে রেস্তোরাঁ গজাল না। বিরয়ানি, পোলাও, চতুর্ককার—কোরমা, কালিয়া, কাবাব, কোফতা—দোপেয়াজা, এবং ঢাকার অত্যুৎকৃষ্ট রেজালা বুরহানী, সাদামাটা নেহারি (এটা বরঞ্চ সহজলভ্য), ঢাকাই পরোটা (ভিতরে অষ্টগ্রামের পনীরের পুর দেওয়া পরোটা), নানাবিধ সমোসা গয়রহ গয়রহ তাই রেস্তোরাঁর মাধ্যমে ভালো করে প্রচার প্রসার লাভ করার পূর্বেই ঢাকার স্কন্ধে ভর করলো ঢাউস ঢাউস বিলিতি মার্কা হোটেল—তাদের অপেয় সুপ, অখাদ্য ইষ্টু, অকাট্য রোস্ট ইত্যাদি ট্যাঁশ যত সব গব্বযন্তনা। আর দিশী পোলাওয়ের নামে এক প্রকারের অগা খিচুড়ি (জগা নয়), কোরমার

নামে আইরিশ ইস্টুর সঙ্গে ইণ্ডিয়ান মশলার সমন্বয়—সরি,—খুনোখুনি। যা কিছু গলা দিয়ে নামে সঙ্গে নিয়ে যায় রিটার্ন টিকিট। তিন দিনের নয়, তিন মিনিটের রিটার্ন। কপাল ভালো থাকলে এবং পেটে সুইডিশ স্টীলের লাইনিং থাকলে ঘণ্টা তিনেকের ম্যাদ।

তবে হাঁ, এখনো আছে বাকির ( বাখর ) খানী রুটি, এবং সুখা রুটি। কথিত আছে জনৈক পশ্চিমা খানদানী মনিষ্যি এস্তের জাগীর পেয়েছিলেন বরিশালে। ঢাকা থেকে বেরুবার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতেন এক ডাঁই সুখা রুটি ( খাস উর্দুতে অবশ্য সুখী রুটি )। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি আবিষ্কার করেন এই অপূর্ব চীজ। কোথায় লাগে এর কাছে উৎকৃষ্টতম ক্রীম ক্রেকার? ঝাড়া একটি মাস থাকে মুরমুর ক্রিস্‌প্‌। জনশ্রুতি, এই বাকিরখানের নামেই হয় বরিশালের অন্য নাম বাকরগঞ্জ।

নেই নেই করে অনেক কিছুই আছে।

কিন্তু—কিন্তু—ঠিক এই সময়টায় তীর্থযাত্রাটা স্থগিত রাখুন। "ভাদ্রাশ্বিনে পূর্বাচলযাত্রা নাস্তি।" একাধিক মৌলিক দ্রব্যের অনটন। তবে কি না শিগগিরই ট্যুরিস্ট বুরো খুলবে। আসা-যাওয়ার সুখ-সুবিধে হবে। আসছে শীত নাগাদ পাসপর্ট ভিজার কড়াকড়িও কমবে।

বন্ধুবান্ধবদের যে সদুপদেশ দিয়েছি, সুশীল পাঠক, তোমাকে তো তার উল্টোটা বলতে পারি!

## ঈদ-আনন্দোৎসব

ধর্মের একটা দিক চিরন্তন এবং যার পরিবর্তন হয় না। এই যে আমি পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বভুবনের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছি তার বাইরে যে-সত্তার কল্পনা আমি অভনুব করতে চাই, তিনি আদিঅন্তহীন, অপরিবর্তনীয়। যে-মানুষ সাধনার ক্ষেত্রে যতখানি অগ্রসর হয় সে সেই অনুপাতে তাঁর নিকটবর্তী হয়, তাঁর অনুভূতি নিবিড়তর হয়। আমাদের হজরত বলতেন তিনি সেই চরম সত্তাকে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন তাঁর স্কন্ধের শিরার ( স্পন্দনের ) মত। বলা বাহুল্য আমরা মনন দ্বারা যে পরমসত্তাকে অনুভব করি তিনি চিন্ময়। শিরার স্পদন-জনিত অনুভূতি সম্পূর্ণ মৃন্ময়। চিন্তায় মারফৎ আমরা কল্পলোকে যে অনুভূতি পাই, স্পর্শলব্ধ দৃঢ় মৃত্তিকাজাত শিরার অনুভূতি তার তুলনায় অনেক বেশী নিবিড় অনেক, বেশী দৃঢ়। তাই হজরত সেই পরম সত্তাকে শারীরিক অভিজ্ঞতার ভ্রান্তিহীন সত্যের মত প্রতি

মুহূর্তে অনুভব করতেন।

পক্ষান্তরে ধর্মানুভূতির জগৎ থেকে বেরিয়ে ধর্মাচরণের কর্মভূমিতে আমরা যখন নামি, তখন সে-আচরণের অনেকখানি দেশকালপাত্রের উপর নির্ভর করে। অবশ্য অন্বেষণ বিশ্লেষণ করলে অবশেষে দেখা যাবে আমাদের প্রত্যেকটি ধর্ম-আচরণও সেই অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্তাশ্রিত। কর্মজগতে তাই প্রথমত পাত্রের উপর নির্ভর করে ধর্মাচরণ—আমল। আমি পক্ষাঘাতে চলৎশক্তিহীন, অথর্ব। মক্কা শরীফ দর্শনের তরে আমার চিত্ত যতই ব্যাকুল হোক না কেন, আমার যত অর্থ-সম্পদই থাকুক না কেন, কোনো ধর্মজ্ঞজন কোনো ফকীহ আমার হজ-যাত্রার অপারগতাকে নিন্দনীয় বলে মনে করবেন না। আমি এ-অবস্থায় যে-কোনো হাজীকে, আমার হয়ে, পুনরায় হজ করার জন্য মক্কা শরীফে পাঠাতে পারি; অবশ্য তার সমস্ত খর্চা-পত্র আমাকেই দিতে হবে। এর থেকে কিন্তু এহেন মীমাংসা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, আমার উপর যে-সব ধর্মাচরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তার সব কটাই আমি অন্য লোককে দিয়ে করাতে পারি।

"পাত্রের" মত "কালও" ধর্মাচরণের সময় হিসাবে নিতে হয়। পূর্বাকাশ ঈষৎ আলোকিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সলাৎজিক্‌র্ ধ্যানধারণার পক্ষে সর্বোত্তম সময় ইহলোকে সব ধর্মই একথা স্বীকার করেছেন।

এস্থলে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, একশ' বছর আগেও সাধারণ ধার্মিকজন আপন ধর্মবিশ্বাস (ইমান) ও ধর্ম-আচরণ ক্রিয়াকর্ম (আমল) নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতো, প্রতিবেশীর ধর্ম সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল ছিল না। থাকলেও সে-কৌতূহল নিবৃত্তি করা আদৌ সহজ ছিল না। কারণ অধিকাংশ স্বধর্মে বিশ্বাসী-জনই পরধর্মাবলম্বীর সংস্রব এড়িয়ে চলতো, তথা তাকে আপন ধর্মকাহিনী শোনাতে কোনো উৎসাহ বোধ করতো না। উপরন্তু হিন্দু, জৈন এবং পার্সীরা বহু শত বৎসর পরধর্মাবলম্বীকে আপন ধর্মে দীক্ষিত করার দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। এবং আশ্চর্য বোধ হয়, আমাদের আলিমফাজিলগণ প্রতিবেশী হিন্দুকে শুদ্ধমাত্র "কাফিরা, হানূদ, মলাউন" ইত্যাদি কটুবাক্য দ্বারা বিভূষিত করেই পরম তৃপ্তি অনুভব করেন; অথচ তাঁরা সকলেই আমার মত না-দানের চেয়ে ঢের ঢের বেশী দানিশমন্দ—তাঁরা বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাঁদের পক্ষে আপন ধর্ম প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য। এবং তাঁরা কেন, অতিশয় আহাম্মুখও জানে, বিধর্মীর ধর্ম তুলে কটুবাক্য বললে, তাকে ইসলামের প্রতি তো আকৃষ্ট করা যায়ই না, উপরন্তু আরেকটি প্রতিবেশীকে রুষ্ট করা হয় মাত্র।...

"কাল" ও "পাত্রের" কথা হল। "দেশের" উপর ধর্মাচরণ নির্ভর করে আরো বেশী। যে-দেশে ছ'মাস ধরে সূর্যাস্ত হয় না, সেখানকার মুসলিমের এবং বাংলা-দেশের রোজা রাখার কায়দা-কানুন যে হুবহু একই রকমের হতে পারে না সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

ঈদের পরব, এবং অন্যান্য তাবৎ পরবই এই "দেশ" অর্থাৎ স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে। এবং এই সুবাদে আবার পাঠকের স্মরণে এনে দি, বহুবিধ কারণে আমরা প্রতিবেশীর ধর্ম সম্বন্ধে এখন আর সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারিনে। মহরমের আর জগদ্ধাত্রী পূজোর মিছিল যদি একই দিনে পড়ে তবে তার হিসেব নগরপাল আগের থেকেই নেয় না তাকে আমরা বিচক্ষণ আই জি বলে মনে করবো না। তদুপরি খৃষ্টান মিশনারীরা দু'শ' বছর ধরে পাক নবীর বিরুদ্ধে এত কুৎসা রটিয়েছে যে তেসাদের ধর্ম—বিংশ শতাব্দীর প্রচলিত খৃষ্টধর্ম, যে-ধর্ম একদিকে শেখায় "কেউ ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দেবে", অন্য দিকে বিশ-পঁচিশ বৎসর পর পর আপোসে কেরেস্তানে কেরেস্তানে লাগায় প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ, টাকার লোভ দেখিয়ে দুই দলই টেনে আনে বিধর্মীদের, সরল নিগ্রোদের, এবং সর্বশেষে শ্মশানযজ্ঞ চালায় হিরোসীমার নিরীহ নারীশিশুদের উপর। এবং সঙ্গে সঙ্গে নতমস্তকে স্বীকার না করে উপায় নেই, ইয়েহিয়া এ-দেশে যে তাণ্ডবনৃত্য জুড়েছিলেন সেটাও ধর্মের নামে, ইসলামের দোহাই দিয়ে সেটাও "জিহাদ"! কিন্তু এই আনন্দের, ঈদের মৌসুমে হানাহানির কাহিনী সর্বৈব বর্জনীয়। আমি শুধু তুলনার জন্য কথাটা পেড়েছি, মুসলমানদের আনন্দোৎসব তার সত্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখাবার জন্য।

ঈদ অর্থাৎ আনন্দ, আনন্দ-দিবস, পরবের দিন। ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ উদ্-দোহাতে কিন্তু ঈদে সীমাবদ্ধ নয়।

ইমানদার ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম ঈদ-উল-ফিতরের আনন্দোৎসব করার বিশেষ একটা কারণ আছে। এক মাস ধরে সুখে-দুঃখে, মানসিক অশান্তির ভিতর দিয়েও উপবাস করাটা সহজ কাজ নয়—কঠিন শারীরিক পীড়া ইত্যাদির ব্যত্যয় অবশ্য আছে। তাই যে মুসল্লি পূর্ণ উনত্রিশ বা ত্রিশ দিন শরিয়তের আদেশমত উপবাস করতে সক্ষম হয়েছে, তার আনন্দই সর্বাধিক হয়। তার অর্থ এই নয়, যে-ব্যক্তি পূর্ণ মাস রোজা রাখতে পারে নি, সে ঈদ আনন্দোৎসবে যোগ দেবে না। অবশ্যই দেবে। যে লোক বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে যোগ দিতে পারে নি—যে কোন কারণেই হোক—তাকে স্বাধীনতা-দিবসের ঈদ-আনন্দোৎসব থেকে বঞ্চিত করার হক স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের পুরুষোত্তমেরও নেই। অতিশয়

অভাজন জনও যদি আনন্দোৎসবে যোগ দিতে আসে তাকে বিমুখ করা, তার সঙ্গে তর্কাতর্কি করা ঈদের অঙ্গহানি করে। কারণ আনন্দের দিনে যে-কোন প্রকারের অপ্রিয় কর্ম করা নিরানন্দের লক্ষণ, অতএব সর্বথা বর্জনীয়।

ঈদ বা আনন্দ সম্বন্ধে সুন্নী ও শীয়া এবং শীয়াদের নানা শাখা-প্রশাখা সকলেই প্রাগুক্ত ধারণা পোষণ করেন। বাংলাদেশে একদা প্রচুর খোজা ও বোরা ছিলেন। এঁদের দু' দলই ইসমাঈলী শীয়া, পক্ষান্তরে মুর্শিদাবাদ ও সিলেটের পৃথ্বীম-পাশার শীয়োরা ইসনাআশারী শীয়া নামে পরিচিত। ঈদ সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা মোটামুটি এক হলেও ঈদ পরব পালনের কর্ম-পদ্ধতি শীয়াদের ভিতর অতি বিভিন্ন।

সুন্নী হানিফীরা বিশুদ্ধ শরীয়তর দৃষ্টিবিন্দু থেকে ঈদ সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ পাবেন ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর শিষ্যগণ, ইমাম আবূ ইউসুফ ইত্যাদির সাহচর্যে সংকলিত প্রামাণিক ফিকাহ্ গ্রন্থে। ঈদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গভীর আলোচনা পাবেন প্রখ্যাত দার্শনিক, ফকীহ ও সূফীহ ইমাম গজ্জালীর অজরামর কিমিয়া সা'দৎ গ্রন্থে। মরহুম ইউসুফ খানের অনুবাদ অনিন্দ্যসুন্দর। কলকাতায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

তুলনাত্মক আলোচনা করলে দেখা যায়, ঈদ বা আনন্দ মাত্রেরই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে "দেশ" বা ভৌগোলিক অবস্থান তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামের উদয়কালে খাস আরবদেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল না। পক্ষান্তরে ভারত বহু বহু শতাব্দী ধরে ছিল ধন-ধান্যের বিত্তবান দেশ। জনসাধারণের অবকাশও ছিল যথেষ্ট। তাই এই বঙ্গভূমিতে, বর্তমান দারিদ্র্যের দুরবস্থাতেও কী হিন্দু কী মুসলমান সকলেই বারো মাসে তের পার্বণের কথা জানে। ঐ সব পার্বণে একদা দানই ছিল প্রধান অঙ্গ—অন্নবস্ত্র, ছত্র, পাদুকা, প্রকৃতপক্ষে কুটির-শিল্পে হেন বস্তু ছিল না যেটা বিত্তবান কিনে নিয়ে দান করতো না। কিন্তু দান বাধ্যতামূলক ছিল না।

পক্ষান্তরে গরীব আরবদেশে নিত্য নিত্য নানামুখী দান কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব ছিল ; ধর্ম কখনো মানুষকে এ-ধরনের কর্ম করতে বাধ্য করে না। তদুপরি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ইসলামের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই সে-ধর্ম যে একদিন আরবভূমির বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে তার সম্ভাবনাও ছিল। সে-সব দেশ আরব-ভূমির চেয়ে বেশী ধনী বা বেশী গরীবও হতে পারে। অতএব যতদূর সম্ভব অল্প সংখ্যক 'ঈদ" বা আনন্দের দিন বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়। দান কিন্তু ইসলামের বিধিবদ্ধ আইন, তার অতি শৈশব অবস্থা থেকেই। ঈদ-উল-ফিতরে দান অলঙ্ঘ্য ধর্মাঙ্গ। বস্তুত ইসলামই ইনকাম ট্যাক্স—জাকাৎ—ধর্মের অঙ্গরূপে পৃথিবীতে

সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক করে।

সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখি, আনন্দোৎসব ( ঈদ ) ও বাধ্যতামূলক ধর্মাচার ( নামাজ রোজা ইত্যাদি ) একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ ওক্‌ৎ নামাজ বাড়িতে পড়তে পারো কিংবা মসজিদে। জুম্মার নামাজ কিন্তু অবশ্যই মসজিদে পড়তে হবে। কারণ ধর্মসাধনা ভিন্ন এর অন্য উদ্দেশ্য ছিল ; প্রত্যেক মুসলিম যেন সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন মসজিদে প্রতিবেশী সমধর্মীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একাত্ম-বোধ-জাত শক্তি অনুভব করতে পারে।

এরপরই আসে বৎসরে দু'বার করে ঈদের নামাজ। ইমানদার মুসলিম মাত্রই চেষ্টা করে, বৃহত্তম মুসলিম জনসংঘের সঙ্গে বৃহত্তম জমাৎ-এ সে যেন নামাজ পড়তে পারে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য যত দূর-দূরান্ত থেকে যত সব নামাজার্থী ঈদ-গাহতে জমায়েৎ হয় তাদের সংখ্যা, তাদের ধর্মানুরাগ দেখে তাদের প্রত্যেকেই যেন আত্মবল, সংহতি-শক্তি অনুভব করতে পারে। ঐদিন পরিচিত জনের মাধ্যমে বিস্তর অপরিচিতের সঙ্গে তার পরিচয় হয় ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দ্বারা। এই দূর-দূরান্ত থেকে, বৃহত্তম জমাৎ যে ঈদ-গাহে হবে, সেখানে নামাজ পড়ার পুণ্য ইচ্ছা নিয়ে ধাবমান যাত্রীদলকে আমি একাধিকবার বহুদূর অবধি তাকিয়ে দেখে দেশের জনসাধারণের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা অনুভব করেছি, বিস্ময় বোধ করেছি।

বাড়িটি ছিল একেবারে বিরাট পদ্মার পাড়ে, রাজশাহীতে। ওপারে, বহুদূরে দেখা যেত শ্যামল একটি রেখা—ভারত সীমান্ত। বারান্দায় দাঁড়িয়েছি অতি ভোরে। অন্ধকার মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, কত না দূর-দূরান্ত থেকে, হেথা-হোথা ছড়ানো চরভূমি থেকে, শুনলুম পদ্মার ও-পার ভারত থেকে, কত না নামাজার্থী শীতের শুকনো বালুচরের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে রাজশাহী শহরের দিকে। শহরের প্রায় পূর্বতম প্রান্তের বাড়িটি থেকে দেখি, যেখানে সূর্য অস্ত যায় সেই দূরে অতি পশ্চিম প্রান্ত অবধি যেন পিপীলিকার সারির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব সন্তান শহরের দিকে এগিয়ে আসছে—নিরবিচ্ছিন্ন ধারায়। পূর্বপ্রান্তে, যারা প্রাচীন দিনের জাহাজের খেয়াঘাট, পাশের ফুটকি পাড়ার দিকে এগিয়ে আসছে তাদের নূতন পাজামা কুর্তা, বাচ্চাদের রঙিন বেশভূষা হাসিমুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সবাই অক্লান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে সদর রাজশাহীর ঈদগাহের দিকে।

এদের কেউই হয়ত জানে না, ঈদের নামাজের সামাজিক মেলা-মেশার তাৎপর্য। গ্রামের জুমাঘর বা শহরের জামি' মসজিদ ত্যাগ করে বৃহত্তর ঈদ-গাহে এসে বহুগুণে বিস্তৃত অঞ্চলের ঐক্যবদ্ধাবস্থায় বেশুমার নমাজরত মুসলিমের সঙ্গে

শব্দার্থে তথা ভাবার্থে কাঁধ মিলিয়ে যখন পদ্মাচরের সরল মুসলিম ঈদের নমাজ পাঠ শেষ করে তখন সে কি সচেতন যে, বর্ষার উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা তার চরকে তার বউবাচ্চাকে বাদ-বাকী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেও ঈদগার মুসল্লীদের কাছ থেকে কখনো বিছিন্ন করতে পারবে না। দীন ইসলামের চিরন্তন চিন্ময় বন্ধনে প্রলয়ঙ্করী পদ্মার তাণ্ডব নর্তন কস্মিনকালেও ছিন্ন করতে পারবে না,—অনুভব করে তার অবচেতন মন।

কার্যত আমরা রোজার ঈদেই আনন্দোল্লাস করি বেশী। কিন্তু সর্ব দৃষ্টিবিন্দু থেকেই ঈদ-উল-আজহা বহুগুণে গুরুত্বব্যঞ্জক।

(১) আপন আবাসে পড়া পাঁচ ওক্ত নামাজের ক্ষুদ্রতম গণ্ডী, (২) সেটা ছাড়িয়ে জুম্মার নামাজের বৃহত্তর পরিবেশ, (৩) সে-পরিবেশ ছাড়িয়ে ঈদগার বৃহত্তম পরিবেশ—সাধারণ মুসলিমের জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু আল্লা যাকে তওফীক দিয়েছে তার জন্য ব্যবস্থা, (৪) সে যেন জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কাশরীফে গিয়ে বিশ্ব মুসলিমের সঙ্গে একত্র হয়। বিশ্ব মুসলিমের সত্তা-সংহতি-ব্যাপ্তি সে যেন দেখে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, তার ক্ষুদ্র সত্তা যেন বৃহত্তম মুসলিম সত্তার সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

সে কাহিনী দীর্ঘ, সর্ব বিশ্বে তার গুরুত্ব ছেয়ে আছে। তার জন্য আগামীতে অন্য ঈদ।

## ভাষা—বাঙলা

বাঙলা ভাষা মারফত সরকারী বেসরকারী সব কাজ নিষ্পন্ন করাটা আপাত-দৃষ্টিতে যতই কঠিন মনে হোক না কেন, আমি অন্তত একটা দেশের কথা জানি, যেখানে এ সমস্যাটা সহস্রগুণে কঠিনতর ছিল এবং সে-দেশ সেটা প্রায় সমাধান করে ফেলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্যালেস্টাইনে এসে জুটতে লাগলো শব্দার্থে কুলে দুনিয়া থেকে ইহুদির পাল। কত যে ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষা নিয়ে তারা এসেছিল সে খতিয়ান নেবার চেষ্টা করা বৃথা। আমাদের পশ্চিম ভারত থেকে পর্যন্ত একদল খাঁটি ভারতীয় ইহুদি মারাঠী জাত তাদের কোঁকনী উপভাষা নিয়ে ইজরায়েলে উপস্থিত হয়। আপন রাষ্ট্র গড়ে তোলার আগের থেকেই ইজরায়েলের প্রধান শিরঃপীড়া ছিল—তাদের রাষ্ট্রভাষা হবে কি? শেষটায় স্থির করা হল হীব্রু—যে ভাষাতে—আমি খুব মোটামুটি আন্দাজ থেকে বলছি—অন্তত হাজার বছর ধরে কেউ কথা বলে নি, সাহিত্য সৃষ্টি করে নি—শুধু পড়েছে মাত্র, তাও সমুদ্রমাত্র ইহুদি যাজক পণ্ডিত রাব্বি সম্প্রদায়। যে-সব ইহুদি অতি প্রাচীনকাল থেকে

প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে অন্য কোথাও যায় নি, নির্বাসিত হলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে ফিরে এসেছে তাদের সকলেরই মাতৃভাষা আরবী—প্রায় বারোশ' বৎসর আরবদের সঙ্গে বসবাস করার ফলে। সেটাকে রাষ্ট্রভাষা করার তো প্রশ্নই ওঠে না। যে সব রাব্বি হীব্রুতে ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও প্রধানত হীব্রুর সমগোত্রীয় আরমেয়িক ভাষায় রচিত তালমুদ্, মিদ্রাশ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পড়তে পারেন তাদের সংখ্যা শতকরা এক হয় কি না হয়। তদুপরি হীব্রুভাষা প্রধানত শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষা। আড়াই হাজার বছর ধরে ইয়োরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতি যে সব শব্দ গড়ে তুলেছে তার একটিও এ ভাষাতে নেই—'দূর-আলাপনী' বা 'অনপনেয়' কালির তো কথাই ওঠে না। সব চেয়ে বড় বিপদ, বহিরাগত ইহুদিদের মাতৃভাষা—রাশান পোলিশ, ইডিশ থেকে আরম্ভ করে ফরাসী, জর্মন, ইতালীয়, ফিনিশ বলতে গেলে য়ুরোপের তাবৎ ভাষা, আরবী, তুর্কী, ফার্সী, কুর্দী এস্তেক কোঁকনী—সে ফিরিস্তি তো আমি আগেই এড়িয়েছি। এখন সমস্যা হল, মাস্টার যে হীব্রু শেখাবে, সেটা কোন্ ভাষার মাধ্যমে? তাবৎ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষার লোক এক বিশেষ জেলায় জড়ো করে তাদের বৈদিক ভাষা শেখানো ঢের ঢের সহজ।

অথচ ইহুদিরা এই অলৌকিক কর্মটি প্রায় সমাধান করে এনেছে। টেলিফোন, ওয়ান উয়ে ট্র্যাফিক, মোটরের যন্ত্রপাতি যত রকম সম্ভব-অসম্ভব শব্দ তৈরি তো করা হলই এবং কত না অসংখ্য ভাষায়, প্রাচীন অর্বাচীন, বর্ণশঙ্কর হীব্রু শব্দসহ এ-সব নূতন শব্দের অভিধান রচিত হল। নূতন নূতন শব্দের ফিরিস্তি, বয়ান, নিত্যি নিত্যি সাপ্তাহিক মাসিকে বেরোয়, সাপ্লিমেণ্টরূপে অভিধান যারা ক্রয় করে ফেলেছেন তাঁদের নামে পাঠানো হয়।

এ-বিষয়ে ইজরায়েল যে কতখানি কৃতকার্য হয়েছে, এবং এখনো তারা কতখানি যোগ্যতাসহ কর্মতৎপর তার একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট। আপনি ট্যুরিস্ট। রাত দুটোর সময় আপনার দরকার হয়েছে একখানা ট্যাক্সির। "অনুবাদ বিভাগকে"—নামটা আমি সঠিক জানিনে—প্রাগুক্ত সাড়ে বত্রিশভাষার যে কোনো একটিতে ফোন করে শুধোতে পারেন, "আপনারা হীব্রুতে ট্যাক্সি শব্দের কি অনুবাদ করেছেন?" পাঁচ সেকেণ্ডের ভিতর হয় হীব্রু শব্দটি পাবেন, নয় অন্য প্রান্ত বলবে, "শব্দটি এতই আন্তর্জাতিক যে আমরা এটার অনুবাদ করি নি। আপনি স্বচ্ছন্দে ট্যাক্সি, টাক্সি টাক্সে যা খুশী বলতে পারেন।" মোদ্দা কথা, যে কোনো লোক ইজরায়েলে আগত ইহুদিদের যে-কোনো ভাষায় যে-কোনো সময় যে-কোনো শব্দের হীব্রু প্রতিশব্দ শুধোতে পারেন ও সদুত্তর পাবেন। অবশ্য এ-হীব্রু যদিও বাইবেলের হীব্রুর উপর

প্রতিষ্ঠিত তবু এটাকে অভিনব হীব্রু বলাই উচিত। এ ভাষার প্রধান সম্পদ, বিদেশী ভাষা থেকে অকাতরে অসংখ্য শব্দ গ্রহণ করে নির্মিত হয়েছে।

এহেন অলৌকিক কাণ্ড অবশ্য সম্ভবপর হত না যদি ইজরায়েলে বিশেষ কোনো ভাষা-ভাষীর জোরদার সংখ্যাগুরুত্ব থাকত। ৩৮ বৎসর পূর্বে আমি যখন তেল-আভিভ যাই তখন রাস্তাঘাটে এত জর্মন শুনতে পাই, ফোন ডিরেক্টরিতে এত বেশী জর্মন নাম দেখি যে, আমার মনে ধারণা হয়েছিল শেষটায় ইজরায়েলের প্রধান ভাষা বুঝি জর্মনই হয়ে যাবে। কিন্তু ইহুদিরা এমনই মরণকামড় দিয়ে আপন ঐতিহ্য, ধর্মমূলক কিংবদন্তী আঁকড়ে ধরতে জানে, উৎপীড়ন অত্যাচার বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে অনুরাগ এমনই দিগ্বিদিকজ্ঞানহীন ধর্মান্ধতায় পরিণত হয়, এবং যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ইজরায়েলবাসী সার্থক রাষ্ট্রনির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছে, তার সম্মুখে প্রাচীনতম পূতপবিত্র হীব্রু ভাষার দুর্বার গতি রোধে কে?

কিন্তু হায়, তবু স্বীকার করতে হয় তাদের সমস্ত আদর্শ, লক্ষ্য, কর্মপন্থা, যে ভূমির উপর তারা সর্বজনগ্রাহ্য রাষ্ট্রভাষার বিরাট সৌধ নির্মাণ করতে চাইছে তার সবই কৃত্রিম, সবই এক স্বপ্নলোকের রূপকথা, মূর্তিমান করার ন দেবায় ন ধর্মায় প্রয়াস।

বার বার অসংখ্যবার নিপীড়িত এই জাতিকে যেন ইয়াহুভে নিষ্ঠুরতর হিটলারের হাত থেকে রক্ষা করেন। এক আমেরিকা ছাড়া তারা এত অসংখ্য শত্রু সৃষ্টি করেছে—বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে, যেখানে বিস্তর খৃষ্টানও ইহুদিদের প্রাচ্যভূমি থেকে বিতাড়িত হতে দেখলে প্রকাশ্যে জয়ধ্বনি করবে—যে, তাদের মনে সম্প্রতি প্রশ্ন জেগেছে মার্কিন সাহায্য বিপদকালে পুনর্বার কতখানি কার্যকরী হবে? ইয়েহিয়ার দিল্-জান্-এর প্যারা দোস্ত নিক্সন কী না করেছেন, নিরস্ত্র রাইফেল মাত্র সম্বল বাঙালকে ঘায়েল করতে, তদুপরি চীনও তো কম যাননি। উভয়ে মিলে ভারতকে জুজুর ভয় দেখিয়েছেন এবং পারলে অবশ্যই ভারত মায় বাঙলাদেশ শ্মশানে পরিণত করতেন। তাই ইহুদিরা দুশ্চিন্তায় পড়েছে, মার্কিন মদতের উপর কতখানি ভরসা করা যায়? তাদের দুসরা ভরসা ছিল, আরব রাষ্ট্রগুলো একদম ঐক্যবদ্ধ হতে জানে না। কিন্তু কে কসম খাবে, এরা কস্মিনকালেও একজোট হবে না?

আমার মনে হয়, পূর্ব বাঙলায় বাঙলাকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রভাষা করার যে উদ্যোগ, বিশেষ করে সরকারের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রীদের দফতরগুলোতে যে সহযোগিতার আত্যন্তিক প্রয়োজন, জনসাধারণের যে সদাজাগ্রত, চেতনাবোধ, বাঙলা খবরের কাগজের সহযোগিতা, দিনের পর দিন নিজেদের প্রচেষ্টায় অন্তত একটি কলম জুড়ে নূতন নূতন যে সব পারিভাষিক শব্দ সরকার তথা জনগণ দ্বারা দৈনন্দিন কর্ম

সমাধানের জন্য নিত্য নিত্য নির্মিত হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা, ভাষাবিদ্, চিকিৎসক, এঞ্জিনিয়ার, আইনবিদ ইত্যাদিদের সে-সব আলোচনায় যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো, এ-সব যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে না। একদা বিশেষ করে ১লা বৈশাখের, কখনো বা ২১ ফেব্রুয়ারির রাত্রে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা তাবৎ ঢাকা শহরের উর্দু, ইংরিজিতে লেখা নেমপ্লেট, দেয়াল থেকে উপড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে বাঙলার প্রভুত্ব বুঝিয়ে দিত। এখন তারা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক। তারা নির্ভয়ে প্রত্যেক গৃহস্থকে অনুরোধ, প্রয়োজন হলে বাধ্য করতে পারে, বাড়ির নাম স্থির করুন, কিন্তু বাঙলাতে। (হোটেল "পূর্বানীর" কর্তৃপক্ষ ৪।৫ বৎসর পূর্বেই জানতেন, হাওয়া কোন্ দিকে বইছে তাই 'মগরীবী সরাই' বা গুলস্তান বোস্তান —'হটেল দ্য লাহোর' বা 'রেস্তোরাঁ আইয়ুবিয়েন্' স্বপ্নেও মনে স্থান দেন নি)। 'ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে যে মহাজন একটা মোটা টাকা পূর্বানীতে খাটান তিনি সোল্লাসে সায় দিয়েছিলেন, কারণ এর বহু পূর্বেই তিনি তাঁর আপন ভবনটির নাম করেছিলেন 'শেফালি' এবং তাঁর মামী শিক্ষা বিভাগের এক প্রধান কর্মচারী তাঁর গৃহভালে তিলক অঙ্কন করেন সনাতন "প্রান্তিক" নাম দ্বারা। আমি জানি, এ-সব এমন কিছু ইন্‌কিলাবী দুঃসাহসী শহীদজনোচিত কঠিন কর্ম নয়, কিন্তু সে-কর্ম প্রতিটি গৃহস্থকে বহুদিন ধরে সচেতন রাখবে, কয়েক মাস পর পর লেটার-হেড ছাপবার সময় আত্মজনকে ঠিকানা দেবার সময় তার একটি বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠবে এবং দৈনন্দিন উত্তেজনাহীন কিন্তু অতিশয় বাস্তব সেই আধ-ভোলা ভাষা আন্দোলনকে প্রগতির পথে সদাজাগ্রত করে রাখবে। ওদিকে চলুক সরকারী প্রচেষ্টা। সেটা বাঙলা একাডেমি, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ —প্রয়োজন হলে নূতন বিভাগ স্থাপন—ইত্যাদি যে কোনো প্রতিষ্ঠান, এ কাজের ভার নিতে পারেন, ইজরায়েলের উদাহরণ তো এইমাত্র দিলুম। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে সর্ব রাজকার্য গুজরাতিতে সমাধান করার জন্য বরোদার মহারাজা যে কমিটি নির্মাণ করেন তার সদস্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল। তবু অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তাঁরা কর্মসমাপণ তথা মুদ্রণান্তে যে বিরাট কোষ দফতরে দফতরে পাঠালেন সে কলেবরের পুস্তক দূর থেকে দেখেই আমি সেই বিভীষিকাকে মারণাস্ত্রক অস্ত্রসমূহের নির্ঘণ্টে স্থান দেবার জন্য পুলিসকে অনুরোধ জানাই। অথচ বছর তিনেকের ভিতরই ইংরিজির স্থান গুজরাতি দখল করে নিল, অক্লেশে!

শ্রীযুক্ত শঙ্কর ক্ষোভ করেছেন, "'বাংলা ভাষা আজ ওপার বাংলাতে তেমন প্রাণোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে না।...একুশে ফেব্রুয়ারি আজ তেমনভাবে আর অনেককে

নাড়া দেয় না।" শ্রদ্ধেয়া উমা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "কোন একটা ঘটনাকে কেউ কোলে নিয়ে তো বসে থাকতে পারে না।" দুটো কথাই ঠিক। কিন্তু শ্রীযুক্ত শঙ্কর তার সঙ্গে সঙ্গে এ-আশাও করছেন, তাঁর সুন্দর সরল ভাষায় সবিস্তর বলে না থাকলেও, একুশের প্রতি শ্রদ্ধা উভয় বঙ্গের বাঙলাপ্রেমীদের চিরন্তন অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস হয়ে থাকবে—নিত্যদিনের ব্যবহারিক ভাবচিন্তার আদান-প্রদানের জন্য তো বটেই, সেই শ্রদ্ধাপ্রসাদাৎ রবি কবি যে অক্ষয় ভাণ্ডার রেখে গেছেন তার যোগ্য ওয়ারিশানও আমরা হতে পারব। আমি আরো আশা রাখি, যোগ্যজন সে ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিও করতে পারবেন। অবশ্যই শঙ্কর এ-কথা বলতে চান নি, একুশেকে "কোলে নিয়ে বসে থাকতে হবে" এবং নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়া উমা এ কথা বলেন নি যে, একুশের প্রতি কোনো প্রকারের শ্রদ্ধা প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ নীতিই চরমে টেনে নিয়ে গেলে সেটা অনেকখানি রিডাক্‌শিও আড আবসুর্ডুম হয় বটে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে উভয়ের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন ধরা পড়ে উভয়ের বক্তব্যের মধ্যে তেমন কিছু নীতিগত পার্থক্য নেই, পার্থক্য যেটুকু আছে—যদি আদৌ থাকে—তবে সেটুকু শুধু মাত্রা নিয়ে। অবশ্য কট্টরপন্থী লোক সর্বাবস্থায়ই কিছু না কিছু থাকবে। ঢাকা কলকাতার বিস্তর লোক আছেন যারা ঘোরতর আপত্তি তুলে বলেন, বাঙলা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা যদি কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হয় তবে সে বিদ্যালয়কে সরকার কোনো আর্থিক সাহায্য তো করতে পারবেনই না—ওই বিদ্যালয়কে কোনো প্রকারের স্বীকৃতিও দিতে পারবেন না।

রবীন্দ্রনাথ নীতিগতভাবে এবং কার্যত পারতপক্ষে বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বাঙলার মাধ্যমেই করতেন—আর আত্মবিভাগের (স্কুলের) তো কথাই। অথচ শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন দাশ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে, স্কুল-স্থাপনার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানার্থে একটি স্বতন্ত্র শাখা খোলেন, কিংবা প্রচেষ্টা করে কৃতকার্য হন নি—আমার ঠিক মনে নেই।

* * *

আমি মাসের পর মাস ঢাকায় কাটিয়ে এসেছি। বাঙলাদেশের অগ্রগতির পথে যে কত কণ্টক, কত অগণন সমস্যা তার একটা অতিশয় অসম্পূর্ণ লিস্টি আমি দিনের পর দিন পূর্ণ একটি মাস ধরে খবরের কাগজ থেকে এবং আত্মজনের বাচনিক—মাত্র এই দুটি পন্থায় নির্মাণ করার প্রচেষ্টাদি—অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে যাই নি, পূর্ববঙ্গীয় সাংবাদিকদের আমি প্রায় চিনি না বললেও অত্যুক্তি হয় না, কোনো প্রকারের স্টাটিস্‌টিক্‌স্ সংগ্রহ করার জন্য যত্রতত্র টো টো করার মত সামান্যতম

শারীরিক বল আমার নেই—বস্তুত প্রতি মাস অন্তত একটিবার বাসভবন দেহলি আমার ছায়াটি দেখেছে কি না সে-বিষয়ে প্রতিবেশীগণের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।···শেষটায় নিরাশ হয়ে ফিরিস্তি নির্মাণকর্মে ক্ষান্ত দি।

বাঙলাদেশ সরকার অতি উত্তমরূপেই অবগত আছেন তাঁদের সমস্যা কি—এই একটি বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই। '৭১-এর ন'মাস যেন বন্যার মত পূব-বাংলার লোককে হত্যা করে, ইতস্তত নিক্ষিপ্ত করে, গৃহহীন অন্নহীন আত্মীয়-আত্মজনহীন করে দিয়েছিল, কিন্তু, কিন্তু এখন? এখন দিনের পর দিন—কত দিন ধরে চলবে তৃষ্ণার্তের এক আঁজলা পানির তরে আকুতি? যে বন্যা কুল্লো মুল্লুক ভাসিয়ে ছয়ালাপ করে দিয়েছিল সেই বন্যাই যাবার বেলা নিয়ে গেছে তৃষাতুরের শেষ জলকণাটুকু! কিস্মৎ! কিস্মৎ!! কিস্মৎ!!!

বাংলাদেশের আপামর আচণ্ডাল ভদ্রতর, কী রাষ্ট্রের কর্ণধার, কী নাগরিক, কী জনপদবাসী সকলের সম্মুখে যে কী নিদারুণ পরীক্ষা সেটা এ বাঙলা থেকে তো কথাই নেই, ও বাঙলায় বাস করেও হৃদয়ঙ্গম করা অতিশয় সুকঠিন।

যত কঠিনই হোক না কেন, একটা সত্যে আমি বিশ্বাস করি:

"আপনি অবশ হলি,
তবে বল দিবি তুই কারে?
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস না রে॥
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়,
আপনাকে তুই করে নে জয়—
সবাই তখন সাড়া দেবে,
ডাক দিবি তুই যারে॥
বাহির যদি হলি পথে
ফিরিস নে তুই কোনোমতে,
থেকে থেকে পিছন পানে
চাস নে বারে বারে॥
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে—
অভয়চরণ শরণ করে
বাহিরে হয়ে যা রে॥"